হৃদয় আমার শান্তিপূর্ণ, চিন্তা অধীরতা হতে মুক্ত,
তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে ধরে দিলাম শিশুর মত
হাসিমুখে পূর্ণ নির্ভর করে।

শ্রীমা


'রূপান্তর' প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সহ যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক, পাঠক ও গ্রন্থ পরিবেশক যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করছেন — তাদের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

❑ গ্রাহক মূল্য ❑❑ ১৫০ টাকা (এক বছরের জন্য)

❑ পত্রিকা প্রকাশের দিন ❑❑ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২৪ এপ্রিল,
১৫ অগাস্ট ও ২৪ নভেম্বর

❑ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

❑ যোগাযোগ ❑ মোবাইল ❑❑ ৯৪৩২৫২৫৭৯২ ❑❑ ৯৮৩১৩২২৪৩০
❑ ই-মেল ❑❑ roopantar@hotmail.com



❑ © শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট,
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী



❑ সম্পাদনা ও প্রকাশনা ❑❑ রত্নাকর সেনগুপ্ত

❑ কো-অর্ডিনেটর ❑❑ জয়দীপ চক্রবর্তী

❑ অক্ষর বিন্যাস ❑❑ শিলালিপি,
বাসব চট্টোপাধ্যায়, ২০এ, বলাই সিংহ লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

❑ মুদ্রণ ❑❑ প্রিন্ট ও প্রসেস,১৫/৫/১, কে. বি. সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০৮০

❑ ৫০ টাকা

রূপান্তর : প্রযত্নে, সত্যপ্রিয়া গণেশ, ১/১এ, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০৩৯

# মায়ের প্রার্থনা

এপ্রিল ৮, ১৯১৪

হে ভগবান, চিন্তায় আমার এসেছে শান্তি, হৃদয় হয়েছে স্থির। গভীর ভক্তি আর অসীম নির্ভরতা নিয়ে তোমার দিকে আমি ফিরেছি। আমি জানি তোমার প্রেম সর্বশক্তিময়, তোমার ন্যায়ের রাজ্য পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে। আমি জানি, সময় হয়েছে, শেষ আবরণটি সরে যাবে, সকল অন্যায় দূর হবে, তাদের স্থান গ্রহণ করবে শান্তির আর সম্মিলিত চেষ্টার যুগ।

হে ভগবান, মন আমার অন্তরের দিকে ফিরেছে, হৃদয় আমার শান্তি পেয়েছে। আমি চলেছি তোমার সন্নিকটে, আমার সমস্ত সত্তা তুমি ভরে রয়েছ। সকল জিনিসে আমি যেন তোমাকে দেখতে পাই, সকলে যেন তোমার দিব্য আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকল বিদ্বেষ যেন দূর হয়ে যায়, সকল হিংসা যেন মুছে যায়, সকল ভয় যেন সরে যায়, সকল সংশয় যেন নির্মূল হয়, সকল অপশক্তি যেন পরাজিত হয়। এই নগরে, এই দেশে, এই পৃথিবীতে প্রত্যেকে যেন অনুভব করে তার হৃদয়মধ্যে এই মহাপ্রেম, সকল রূপান্তরের এই উৎস স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।

হে ভগবান, তোমার প্রেমের কাছে আমার সনির্বন্ধ এই ভিক্ষা — আমার অভীপ্সাকে এতখানি তীব্র করে তোল যেন তার ফলে সর্বত্র অনুরূপ আস্পৃহা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে; দয়া, ন্যায়, শান্তি যেন একচ্ছত্র প্রভু হয়ে রাজত্ব করে; অজ্ঞান অহংকার যেন পর্যুদস্ত হয়, অন্ধকার যেন তোমার নির্মল আলোকে তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়; অন্ধ যেন লাভ করে দৃষ্টি, বধির পায় যেন শ্রবণশক্তি, তোমার দিব্যবিধান যেন সর্বত্র ঘোষিত হয়; তোমার সঙ্গে সম্মিলন যেন নিরন্তর নিবিড়তর হয়ে চলে, সুসামঞ্জস্য যেন অবিরল সুষ্ঠুতর হয়ে ওঠে,সকলে যেন একসঙ্গে মিলে তোমার দিকে বাহু প্রসারিত করে দেয়, তোমার সঙ্গে সংযুক্ত হতে, পৃথিবীর উপর তোমাকে প্রকাশ করতে।

হে ভগবান, মনকে অন্তর্মুখী করে, হৃদয়কে সূর্যালোকে পূর্ণ করে, তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি অকুণ্ঠভাবে, আমার "আমি" তোমার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

**উৎস : *Prières et Méditations***
**গ্রন্থের অনুবাদ : *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ : ৬৮-৬৯,**
**অনুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত**

রূপান্তর বর্ষ : ২৪ সংখ্যা : ২ ২৪ এপ্রিল ২০২১

❑ সূচী ❑

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | পৃষ্ঠা |
| ❑ সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে : যখন আমি প্রথমবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম... | ❑❑ | শ্রীমা | ১ |
| ❑ শ্রীঅরবিন্দকে স্বচক্ষে দেখার আগে... | ❑❑ | শ্রীমা | ২ |
| ❑ তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ৩ |
| ❑ দিব্য কর্মী | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ৪ |
| ❑ এই ঘোর অমানিশাকে দূরীভূত করে, বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, ধ্বংসের মাঝে দিব্যসৃষ্টিকে গড়ে তোলবার মহৎ অভিলাষে ভগবানকে ডাকা... | ❑❑ | শ্রীমা | ৬ |
| ❑ বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ৮ |
| ❑ সমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ | ❑❑ | শ্রীমা | ১০ |
| ❑ মায়ের উত্তর | ❑❑ | শ্রীমা | ১৪ |
| ❑ বিপরীত ভাবে, আমি তোমাদের বলি যে, পৃথিবীটা...অতি অন্ধকার...অতি অচেতন, দুঃখ দুর্দশায় ভরা, যন্ত্রণাগ্রস্ত বলেই সে হতে পারে আবার পরম সৌন্দর্য, পরম জ্যোতি, পরম চেতনা, পরম আনন্দ | ❑❑ | শ্রীমা | ১৭ |
| ❑ সে একটা যুগ গেছে, যখন মানুষ ছিল নিরক্ষর মেষপালক,...তার ভেড়ার পালের সঙ্গে তারাভরা আকাশের নিচে শুয়ে শুয়ে রাত কাটাত আর সেই তারাগুলোর মাঝে কি লেখা আছে তা পড়ে, কি ঘটতে চলেছে তা সে বুঝতে পারত।... তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ, আর ছিল সেই অপূর্ব শান্তি, যেটাই হল জীবনের সরলতার উৎস | ❑❑ | শ্রীমা | ২০ |
| ❑ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ২৪ |
| ❑ প্রাণের রূপান্তর | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ২৭ |
| ❑ যোগপথের বাধাবিঘ্ন | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ৩০ |
| ❑ আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর | ❑❑ | শ্রীঅরবিন্দ | ৩৩ |

সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে:

## "যখন আমি প্রথমবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম, তখন মুহূর্তের মধ্যে আমি নিশ্চিতভাবেই জানলাম যে এখানে তিনিই উপস্থিত রয়েছেন, যিনি হলেন স্বয়ং ভগবান।..."[১]

—শ্রীমা

**মার্চ ৩০, ১৯১৪**[২]

যারা সমগ্রভাবে তোমার সেবক, তুমি আছ এ চেতনা যারা সম্পূর্ণ লাভ করেছে, তাদের সান্নিধ্যে এসে আমার মনে হয়, আমি যা উপলব্ধি করতে চাই তা হতে আমি দূরে কত দূরেই না পড়ে রয়েছি। আমি জানি যে-জিনিস আমাকে ধারণায় আনতে হবে, তার তুলনায় যে-জিনিস এখন আমার ধারণায় উর্ধ্বতম মহত্তম শুদ্ধতম তা এখনো অন্ধকারাবৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন। কিন্তু এ অনুভূতি আমাকে আদৌ হতাশ করে না, বরং আমার আস্পৃহাকে, আমার সামর্থ্যকে, আমার ইচ্ছাশক্তিকে সতেজ করে, সবল করে যাতে আমি সকল বাধা জয় করতে পারি; যাতে অবশেষে তোমার দিব্যবিধানের সঙ্গে, তোমার কর্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি।

ধীরে ধীরে দিগ্বলয় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, পথ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রতিমুহূর্তে এগিয়ে চলেছি নিশ্চয় হতে আরো-নিশ্চয়ের দিকে।

শত শত জীব যদি গাঢ়তম অজ্ঞানের মধ্যে নিমজ্জিত রয়ে থাকে—কিছু এসে যায় না তাতে। কাল যাঁকে আমরা দেখেছি তিনি পৃথিবীতে আছেন। তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট প্রমাণ যে একদিন আসবে যখন অন্ধকার আলোকে রূপান্তরিত হবে, যখন তোমার রাজত্ব সত্যসত্যই পৃথিবীর উপর স্থাপিত হবে।

হে ভগবান, এই অত্যাশ্চর্যের দিব্যস্রষ্টা, আনন্দে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পরিপ্লুত হয়ে যায় যখন এ চিন্তা আমি করি—আশা আমার অসীম হয়ে ওঠে।
ভগবান, আমার আরাধনা সকল বাক্যের অতীত, পূজা আমার নির্বাক।

**উৎস: *Prières et Méditations*, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত**

---

[১]Glimpses of the Mother's life (Part one), Edited by K.D. Sethna,PP.132-33

[২] শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমায়ের প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী দিনে শ্রীমা তাঁর আধ্যাত্মিক দিনলিপিতে এই প্রার্থনাটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।



## "শ্রীঅরবিন্দকে স্বচক্ষে দেখার আগে, আমি এতদিন যে কঠোর সাধনা করেছিলাম, যে গভীর সব উপলব্ধি আমার হয়েছিল এবং যেসবের সম্বন্ধে আমার বেশ বিশ্বাসও ছিল, ...আমার সাধনার উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সে সমস্তই এখন যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল।"

—শ্রীমা

**বুধবার, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৫১**

আজকের Prayers ক্লাসে শ্রীমা পাঁচটি ধ্যানলিপি পড়লেন—১৯১৪ সালের ১, ২,৩,৪ এবং ৭ এপ্রিলের।

শিশুমহলের প্রশ্ন হল "অলীক স্বপ্নের মত মনগড়া যত কিছু অন্তর্হিত হয়েছে" এর মানে কি?

শ্রীমা: শ্রীঅরবিন্দকে স্বচক্ষে দেখার আগে, আমি এতদিন যে কঠোর সাধনা করেছিলাম, যে গভীর সব উপলব্ধি আমার হয়েছিল এবং যেসবের সম্বন্ধে আমার বেশ বিশ্বাসও ছিল, তাকে ঠিক অহঙ্কার বলব না, তবে আমার সাধনার উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—সে সমস্তইএখন যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাঁর কাছে এসে, তাঁকে পেয়ে, তাঁর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম, কাঁধ থেকে সত্যিই বিরাট একটা বোঝা নেমে গেল; এতদিন ধরে একেবারে একা একা নিজেকে নিয়ে চলতে হয়েছে, সাহায্য পেয়ে এসেছি সর্বত্রই, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করার মতন কাউকে পাইনি, নিজের সম্বন্ধে যে দায়িত্ব, সর্বদা যে কঠোর রীতিনীতির মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে হত, এখন সে সবের থেকে ভারমুক্ত হলাম, এখন থেকে আমাকে আর নিজের জীবনের বা সাধনার জন্যে কোন কিছুই ভাবতে হবে না, করতে হবে না, সর্বদা নির্দেশ পাব—তেমনি আবার, আর এক দিকে, উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা আমার অন্তরে সত্যের স্বরূপ যে ভাবে আকার নিয়ে উঠেছিল, সে সমস্তই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার কিছুমাত্রও আর রইল না। আমি হয়ে উঠলাম শূন্য, একেবারে সম্পূর্ণ ফাঁকা। পুরাতন তার সকল ঐশ্বর্য নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করল। আমি যেন নবজাত শিশুর মতন হয়ে আবার জন্মলাভ করলাম, পূর্বের সে আকৃতি আর নেই এখন। পরের লিপিগুলিতে এই নতুন বিকাশের অবস্থার বর্ণনা পাবে।

**উৎস: *শ্রীমায়ের পাঠশালা* : মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**

# তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি...

—শ্রীঅরবিন্দ

যদি তুমি দিব্যকর্মের সত্য কর্মী হতে চাও, তবে তোমার লক্ষ্য প্রথমেই হবে সকল বাসনা থেকে, আত্মসর্বস্ব অহঙ্কার থেকে, নিজেকে নিঃশেষে মুক্ত করা। তোমার সমস্ত জীবন হবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি ও বলি। কর্মে তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে ভাগবতী শক্তির লীলায় সেবা করা, তাঁকে ধারণ করা, সার্থক করা, তাঁর প্রকাশের যন্ত্র হয়ে ওঠা। ভাগবত চেতনায় তোমাকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে হবে যেন শেষে তোমার ইচ্ছায় ও তাঁর ইচ্ছায় কোন পার্থক্য আর না থাকে, তাঁর প্রেরণা ব্যতীত আর কোন সঙ্কল্পই তোমার মধ্যে স্থান না পায়, তাঁরই সজ্ঞান কর্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আশ্রয় করে আর কোন কর্মই যেন না হয়।

যে পর্যন্ত তুমি এই সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব স্থাপন করতে না পেরেছ ততদিন মনে করবে তোমার দেহ ও আত্মা নিয়ে তুমি সৃষ্ট মায়েরই সেবার জন্য, তোমার সব কর্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে। পৃথক কর্ত্তৃত্ববোধ যদি তোমার মধ্যে প্রবল থাকে, যদি তোমার অনুভব হয় তুমিই কর্ম করে চলেছ, তবুও সে কর্ম করবে তাঁরই উদ্দেশ্যে। অহঙ্কারের আপন অভিরুচির উপর সকল ঝোঁক, ব্যক্তিগত যাবতীয় লাভের লালসা, আত্মসার বাসনার সকল প্রত্যাশা স্বভাব থেকে উন্মূলিত করতে হবে। ফলের জন্য কোন দাবি থাকবে না, পুরস্কারের জন্য কোন স্পৃহা থাকবে না। একমাত্র যে ফল তুমি পাবে তা হল মা ভগবতীর তৃপ্তি, তাঁর কর্মের সিদ্ধি; তোমার একমাত্র পুরস্কার ভাগবত চেতনার শক্তির আনন্দের মধ্যে তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রগতি। সেবার আনন্দ, কর্মের সহায়ে অন্তরের পুষ্টির আনন্দ—নিরহঙ্কার কর্মীর পক্ষে এই যথেষ্ট প্রতিদান।

কিন্তু একদিন আসবে যখন ক্রমেই তোমার এ অনুভব বৃদ্ধি পাবে যে তুমি যন্ত্র, কর্মী নও। কারণ প্রথমত ঐকান্তিক নিষ্ঠার বলে মায়ের সাথে তোমার মিলন এমন নিবিড় হয়ে উঠবে যে কেবল তদ্‌গত হয়ে তাঁর হাতে সর্বস্ব অর্পণ করলেই তাঁর আশু নির্দেশ, তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ ও প্রেরণা পাবে—কি করতে হবে, কি উপায়ে করতে হবে, ফলই-বা কি, এসকলের অভ্রান্ত সন্ধান মিলবে। এর পরে তোমার উপলব্ধি হবে ভাগবতী শক্তি কেবল প্রেরণা দেন না, পথ দেখিয়ে চলেন না, পরন্তু তোমার কর্মের প্রবর্তন ও উদ্‌যাপন তিনিই করেন। তোমার সকল গতিবিধির উৎস তিনি তোমার সকল শক্তি তাঁরই, তোমার মন প্রাণ দেহ তাঁর ক্রিয়ার চৈতন্যময় আনন্দময় যন্ত্র, তাঁর লীলার উপকরণ, স্থূল জগতে তাঁর প্রকাশের আধার। এই ঐক্য ও নির্ভর অপেক্ষা সুখের অবস্থা আর কিছু হতে পারে না, এই পদে উঠে দাঁড়ালে অজ্ঞানের যে সংঘর্ষময় বেদনাময় জীবন তার সীমানা পার হয়ে তুমি প্রবেশ করবে এসে তোমার





অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে, তথাকার গভীর শান্তির, তীব্র আনন্দের মধ্যে।

এই রূপান্তর যখন চলছে ঠিক তখনই বিশেষ করে তোমার প্রয়োজন হবে অহঙ্কারের সকল বিকৃতি-দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। তোমার আত্মদানের, উৎসর্গের নির্মলতাকে কোন দাবি কোন জেদ অতর্কিতে এসে যেন কলঙ্কিত না করে। কর্ম বা কর্মফলে কোন আসক্তি রাখবে না, কোন রকম সর্ত উপস্থিত করবে না, যে শক্তির কাজ তোমাকে অধিকার করা, ফিরে তাকেই তুমি অধিকার করবে—এরকম কোন দাবি করে বসবে না; যন্ত্র বলে কোন গর্ব রাখবে না, কোন আত্মম্ভরিতা বা ঔদ্ধত্য রাখবে না। তোমার মনের প্রাণের দেহের মধ্যে কোথাও এমন কিছু থাকতে দেবে না যা তোমার ভিতর দিয়ে যে মহতী শক্তিরাজি কাজ করে চলেছে তাদের কোনক্রমে নিজের ব্যবহারের জন্য বিকৃত করে ফেলতে পারে বা আপন ব্যষ্টিগত স্বতন্ত্র তৃপ্তির জন্য অধিগত করতে পারে। তোমার শ্রদ্ধা, তোমার ঐকান্তিকতা, তোমার আস্পৃহার অমলতা পায় যেন পরম পরাকাষ্ঠা, তাতে তোমার সত্তার সকল ক্ষেত্র সকল স্তরকে যেন রাখে পরিপূর্ণ করে। তা হলে যেসব উপকরণে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, যত সব প্রভাবে বিকৃতির জন্ম দেয়, একে একে তারা তোমার প্রকৃতি থেকে স্খলিত হতে থাকবে।

এই সিদ্ধির শেষ অবস্থা আসবে তখন যখন তুমি মা ভগবতীর সাথে সম্পূর্ণ একীভূত, যখন এ বোধ আর তোমার থাকবে না যে তুমি ভিন্ন, পৃথক এক সত্তা, যন্ত্র, সেবক বা কর্মী। তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি, তাঁর চেতনা ও শক্তির সনাতন অংশ, সতত তিনি তোমার মধ্যে, তুমিও সতত তাঁরই মধ্যে। তোমার সকল চিন্তা সকল দৃষ্টি সকল কর্ম তোমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গ নিঃসৃত তাঁর হতে—তাঁরই—এই হবে তোমার সহজ স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধি। তুমি জানবে দেখবে বোধ করবে যে মা তোমাকে এক বিশেষ ব্যক্তি ও শক্তিরূপে তাঁর আপন সত্তা থেকে নিজেই গড়ে তুলেছেন, লীলার জন্য অন্তর থেকে বাহিরে প্রকট করে ধরেছেন, তবুও সর্বদা তাঁরই মধ্যে নিরাপদে তুমি রয়েছ, তাঁর সত্তায় তোমার সত্তা, তাঁর চেতনায় তোমার চেতনা, তাঁর শক্তির শক্তি, তাঁর আনন্দের আনন্দ তুমি। এই অবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে আর তাঁর অতিমানস তেজোরাজি তোমাকে অবাধে পরিচালিত করতে পারবে, তখনই দিব্যকর্মে হবে তোমার সর্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধি। জ্ঞান, সঙ্কল্প, কর্ম হবে অভ্রান্ত সরল জ্যোতির্ময় স্বতঃস্ফূর্ত নির্দোষ—পরমেশ্বর হতে উৎসারিত এক প্রবাহ, শাশ্বতের এক দিব্য অয়ন।

**উৎস:*The Mother* অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী, নবম খণ্ড, মূল বানান অপরিবর্তিত।**

# দিব্য কর্মী

## শ্রীঅরবিন্দ

সমচিত্ত দাঁড়িয়ে আমি পৃথিবীর সকল ঘটনার সম্মুখে;
সর্বত্র শুনি তোমার পদক্ষেপ: অদৃশ্য তোমার চরণ
নিয়তির পথ সব বেয়ে চলে যায় আমার পুরোভাগে।
জীবনে নিখিল গহন সমস্যাসকলের পূর্ণ মূর্তি তুমি।

আমার অন্তঃপুরুষের শান্তিকে টলায় না কোন বিপদ:
আমার কর্ম যত তোমারই; তোমারই কাজ করে চলে যাই আমি;
ব্যর্থতা আশ্রয় পেয়েছে তোমারই অমর বাহুপাশে,
বিজয় তোমারই যাত্রাপথ, ছায়া তার পড়ে ভাগ্যের দর্পণে।

মানব-নিয়তির সঙ্গে এই যে রূঢ় সংঘর্ষ,
আমার অন্তরে তোমার হাসি সেখানে যোগায় সকল সামর্থ্য;
তোমার মহাবল আমার ভিতরে বিরাট লক্ষ্য ধরে তার কাজ করে চলে,
চেয়ে দেখে না মহাকাল অজগর কত দীর্ঘ করে ধরে তার মন্থর ক্রমসর্পণ।

অন্তঃপুরুষেরে আমার হনন করে সামর্থ্য নাই কারো; তোমারই অন্তরে জীবন তার।
তুমি রয়েছ, অমর আমি তাই।

**উৎস: *The Divine Worker,* অনুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত,**

**।। ২৪এপ্রিল ১৯২০ সম্পর্কে।।**

আমার পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসার বার্ষিকী হল বিরুদ্ধ শক্তিদের উপর নিশ্চিত বিজয়লাভের বাস্তব চিহ্ন।

২৪ এপ্রিল ১৯৩৭ — শ্রীমা

উৎস: *Words of the Mother,* Cent Edi.Vol.No.13,
অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত



**"...এই ঘোর অমানিশাকে দূরীভূত করে, বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, ধ্বংসের মাঝে দিব্যসৃষ্টিকে গড়ে তোলবার মহৎ অভিলাষে ভগবানকে ডাকা, যাতে তিনি তাঁর অধিকার পুনরায় গ্রহণ করেন, জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে ত্রাণ করেন।..."—শ্রীমা**

[শ্রীমায়ের সঙ্গে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ও সাধকদের *ধ্যান ও প্রার্থনা* গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা]

তৃতীয় প্রশ্ন: ওই ধ্যানলিপিরই "...*জগতের বুক থেকে প্রচণ্ড জগদ্দলের চাপ বিদূরিত কর।...*" (৫ই আগস্ট, ১৯১৪)—মানে কি?

শ্রীমা: ওই একই কথা। যুদ্ধের সময়ের কথা। যুদ্ধের উৎপত্তির কারণটা যখন মানুষ আবিষ্কার করল, সে দেখল যে এক আসুরিক শক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করছে যাতে সে জড় জগতে আত্মকর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে। যা কিছুই দিব্য-আনুকূল্য করতে প্রস্তুত সে সবকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মানুষের অন্তরে সে আস্তানা গেড়েছে; যতরকমের তামস, অজ্ঞান অন্ধকারময়, প্রতিকূল ইচ্ছা তাদের ঘাড়ে ভর করেছে। পৃথিবী এই ভয়াবহ জগদ্দলের ভারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই সময় যদি একে থামানো না যায় তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের চেতনা দুই মহাযুদ্ধের মাঝে পড়ে সাঙ্ঘাতিক বদলে গেছে। যত ক্ষুদ্রতা, নিম্নমুখী গতি, হিংস্র লোলুপতা, বিনাশ্রমে অর্থলুণ্ঠনের মতলব ইত্যাদি তাদের ওপর ভর করেছে। এই ঘোর অমানিশাকে দূরীভূত করে, বিধ্বস্ত, বিক্ষুব্ধ, ধ্বংসের মাঝে দিব্যসৃষ্টিকে গড়েতোলবার মহৎ অভিলাষে ভগবানকে ডাকা, যাতে তিনি তাঁর অধিকার পুনরায় গ্রহণ করেন, জগতকে ধ্বংসের হাত থেকে ত্রাণ করেন।

৪র্থ প্রশ্ন: ৬ই আগস্ট, ১৯১৪তে লেখা "*কি ভুল হচ্ছে, কেন দেরি হচ্ছে?*"—*বিশাদ করে বল।*

শ্রীমা: দিব্য ইচ্ছাপূরণের জন্যে জগতের ধ্বংসলীলার মুখে নিজেকে মহাযজ্ঞের প্রধান বলি করে তুলে, আমি ভেবেছিলাম দিব্যশক্তি অতি চটপট কাজ শেষ করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখি তা হবার কোনই লক্ষণ নেই, বরং ক্রমশই অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে লাগল। আমিও ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলাম, নিজের দেহের ওপর বিশ্বের এই তাণ্ডব লীলার আঘাত খেয়ে খেয়ে। তাই অধীর হয়ে আমি দিব্যশক্তির কাছে অনুযোগ করতে লাগলাম, কেন এমন হচ্ছে? কি দোষ, কি ত্রুটি হচ্ছে? কেন তোমার শক্তি অসুরনাশ করছে না? কেন আমার অখণ্ড আত্মদান তোমার গ্রহণযোগ্য

হয়ে উঠছে না? দেখলাম দেবশক্তির পক্ষে যারা অস্ত্রধারণ করেছে তাদের মধ্যেও প্রচুর গণ্ডিবদ্ধ অন্ধকারময় অবস্থা রয়েছে, যা দিব্যশক্তির স্ফুরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নিজের মধ্যে সে সবের স্পন্দন ও অনুভূতি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। কাজ বেড়ে গেল—যা কয়েকদিনেই শেষ হওয়া উচিত তা শেষ হতে দীর্ঘ চার বৎসর লাগল। কিন্তু অবশেষে দেখলাম, কিছুই বৃথা হয়নি, বেশি সময় লাগল বটে।

বুধবার, ১৮ই জুন ১৯৫২

আজ Prayers পড়ার দিন। শ্রীমা পড়লেন:১৯১৪ আগস্টের ১১, ১৩, ১৬ ও ১৭ তারিখের ধ্যানলিপিগুলি। তারপর প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল।

১১ই আগস্ট

*"পৃথিবীর কালো মেঘ আবার তারই ওপর ভর করেছে''*— মানে কি?

শ্রীমা: এ হল অলৌকিক জগতের ক্রিয়ার বর্ণনা। মানুষ তার নিজের ভিতর থেকে যত অজ্ঞান অসৎ অভিপ্রায় প্রভৃতিকে ঠেলে বের করে দিলে, সেগুলো যেন উড়ে গিয়ে আকাশের গায়ে জমা হতে থাকে। এইভাবে জমে জমে বিরাট স্তূপ হয়ে ওঠে। তারপর একটা সময় আসে যখন সেগুলোর ভার এত বেশি হয় যে আবার নিচের দিকে পড়ে যায়। এ সব লেখা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে।

৩০/৭/৪৭-এ এই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন, এই যুদ্ধের সময় পৃথিবী তার যত অসৎ-শক্তিকে, যত অজ্ঞান ও বিরোধী ইচ্ছাকে ঠেলে তুলেছিল। সেগুলো যেন মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে সূর্যালোক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে। প্রাণজগৎ থেকে তখন চাপ দিয়ে এই সব অন্ধকারের মেঘকে পৃথিবীতে ঠেলে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে প্রাণজগতের সত্তারাও, অর্থাৎ আসুরিক শক্তিসব, পৃথিবীতে নেমে আসে।... আমাদের প্রাণসত্তা উক্ত প্রাণের অংশ কি-না, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমা বলেন, না, আমাদের প্রাণময় সত্তা চৈত্যপুরুষের প্রভাবে চালিত হয়। তবে বাইরের আসুরিক প্রাণজগতের শক্তিদের ডাকে যেন আমরা সাড়া না দিই, সে বিষয়ে অনুক্ষণ সচেতন থাকতে হবে।

**উৎস:** *শ্রীমায়ের পাঠশালা:* মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে ভগবানই একমাত্র আশ্রয়,
তাঁর কাছেই পাওয়া যায় পরম নির্ভর।

শ্রীমা

উৎস: *মাতৃবাণী*, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত



# বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা

(নির্বাচিত অংশ)

**শ্রীঅরবিন্দ**

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১-এর পর)

### পৌনঃপুনিক বিপদ নিবারণ

প্র: বার বার একটা বিপদ এলে তাকে সামলাবার উপায় কি?

উ: সমতা, প্রত্যাখ্যান, মায়ের শক্তিকে আহ্বান। ১-৮-১৯৩৩

*

আগেকার মিশ্রিত ভাব পুনঃপুনঃ ঘুরে ঘুরে আসাই তোমার প্রতিবন্ধক হচ্ছে। এখানে দরকার ওর থেকে বেরিয়ে এমন আভ্যন্তরিক যৌগিক শান্তির অবস্থাতে যাওয়া যা ওর দ্বারা বিচলিত হবে না। তেমন অবস্থা এলে তখন অনুভব করবে মায়ের নিত্য উপস্থিতি, ও তাঁর নির্দেশ, কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য নয় কিন্তু সর্বদার জন্য একটা উন্মীলন ও প্রস্ফুটন, চৈত্য অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক আলো এবং আনন্দের অবতরণ। এর জন্য তুমি যথোচিত সাহায্য পাবে। ৭-৩-১৯৩৭

*

বহু লোকের এমন অবস্থা হয় (এমনই মানবপ্রকৃতি) আর এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও আছে: মায়ের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে আভ্যন্তরীণ মনকে শান্ত করা (বাহ্য মন উত্যক্ত করতে থাকলেও), আর মায়ের শান্তি ও শক্তিকে নিজের আধারের মধ্যে আহ্বান করা, যা তোমার উপরদিকেই অবস্থান করছে। যেমনি তাকে তুমি চেতনভাবে অনুভব করবে অমনি তার দিকে নিজেকে খুলে রেখে তাতেই লেগে থেকে পুরোপুরি তাকে কাজ করতে দেবে, তোমার নিজের তরফ থেকে তাকে নিত্য সমর্থন দিয়ে আর সচেতনভাবে অন্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে—তাতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আভ্যন্তরীণ সত্তা প্রশান্তি লাভ ক'রে মায়ের শক্তি ও শান্তি, আনন্দ ও উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে—আর তখন বাহ্য সত্তাও তার অনুগামী হতে বাধ্য হবে।

৮-৫-১৯৩৩

### খারাপ অবস্থা থেকে উদ্ধার

এই সব খারাপ অবস্থা আসে সামান্য কোনো কারণে, আভ্যন্তর অবস্থিতি থেকে বাহ্য চেতনাতে নেমে এলে। যখন এমন হবে তখন বিচলিত না হয়ে শান্ত ভাবে থেকে মাকে ডাকবে আর ভিতরে ফিরে যাবে। ২৪-১-১৯৩৬

*

মাঝে মাঝে চেতনার অবনতি সকলেরই হয়। তার কারণ থাকে নানারকম, হয়তো কোনো বাহ্য স্পর্শ, প্রাণসত্তার ভিতরকার এমন কোনো অংশ যা তেমন বদলায়নি, বিশেষত নিম্ন প্রাণে, বা দেহ প্রকৃতির তমঃ বা জড়তা থেকে। ওরূপ হলে তখন নীরব থাকবে, নিজেকে খুলে ধরে মাকে ডাকবে, প্রকৃত অবস্থা ফিরে পেতে আস্পৃহা করবে আর স্বচ্ছ বিচারণা শক্তি চাইবে যাতে নিজের মধ্যে কোথায় গলদ আছে তা বুঝে তার সংশোধন করা যায়। ৪-৩-১৯৩২

**বিরুদ্ধ আক্রমণে মায়ের সাহায্য**

অজ্ঞানময় শক্তিরা ওৎ পেতে থাকে আর একত্রে আক্রমণ করে। সে আক্রমণকে যতবার প্রতিহত করো ততবার আধারের মধ্যে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায়, মনে প্রাণে দেহে বা সত্তার অন্যান্য অংশে মায়ের জন্য কিছু ক্ষেত্রজয় ঘটে। প্রাণসত্তার মধ্যে মায়ের অধিকৃত স্থান যে বাড়ছে, তার প্রমাণ এই যে ঐসব আক্রমণকে তুমি বাধা দিতে পারছ, যা আগেকার দিনে তোমাকে পেড়ে ফেলে দিতো।

ঐরূপ বিপদের সময় মায়ের উপস্থিতি বা শক্তিকে আহ্বান করাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

তুমি যে ভিতরে কথা বলো তা মায়েরই সঙ্গে, তিনি সর্বদাই তোমার কাছে আছেন। দরকার কেবল তাঁর কথা ঠিকভাবে শুনতে পারা, অন্য কোনো কণ্ঠস্বর যেন না শোনো। ৭-১২-১৯৩৩

*

আক্রমণ যতই জোরালো হোক, আর তা যদি তোমাকে অভিভূতও করতে পারে, তথাপি যদি তোমার মায়ের দিকে নিজেকে খুলে ধরা অভ্যস্ত থাকে তাহলে তা শীঘ্রই সরে যাবে। চুপচাপ যদি মায়ের শক্তির দিকেই নিজেকে খুলে ধরো তাহলে শান্তি আবার ফিরে আসবে। সত্য একবার যখন তোমার মধ্যে কিছুটাও বিকাশ পেয়েছে, তখন বিপরীত ক্রিয়াতে সাময়িকভাবে ঘন মেঘ হাজার জমে উঠলেও আকাশের সূর্যের মতো আবার তার দীপ্তিচ্ছটা বেরিয়ে পড়বে। সাহসিকতা না হারিয়ে আস্থার সঙ্গে অধ্যবসায় ক'রে যাও। ১৪-৩-১৯৩২

*

প্র: বিরোধী শক্তিদের ক্রিয়াতে সাধকদের যে দুর্ভোগ আসে তাকে এড়াবার সদুপায় কি?

উ: মায়ের উপর অবিচল শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ সমর্পণ। ১৭-৬-১৯৩৩

(ক্রমশ)

**উৎস: *On the Mother* , মূল অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য**



# সমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ

## শ্রীমা

### সমর্পণ এবং যোগ[১]

তোমার জীবনের দায়িত্ব ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত, তাকে সমর্পণ বলে। এই সিদ্ধান্ত ছাড়া আদৌ কিছু সম্ভব নয়। তুমি যদি সমর্পণ না কর, তাহলে যোগ করা নিয়ে কোন কথাই উঠতে পারে না। আর সব স্বভাবতই এর পরে আসে, কেননা পুরো প্রক্রিয়াটা সমর্পণ দিয়েই শুরু হয়। তুমি সমর্পণ করতে পার হয় জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে কিংবা ভক্তির পথে। তোমার একটা তীব্র পূর্বানুভব থাকতে পারে যে একমাত্র ভগবানই সত্য এবং সেইসঙ্গে একটা আলোকোজ্জ্বল প্রতীতি যে ভগবান ছাড়া তুমি কাজ চালাতে পার না। অথবা তোমার একটা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি হতে পারে যে একমাত্র এই পথেই সুখী হওয়া যায়, কিংবা থাকতে পারে শুধুমাত্র ভগবদনুগত হবার জন্য একটা তীব্র চৈত্যিক আস্পৃহা: ‘‘আমি আমার নয়,’’ ব'লে তুমি তোমার সত্তার দায়িত্ব সত্যের হাতে সঁপে দাও। তারপর আসে উৎসর্গের পালা: ‘‘এই আমি, ভালমন্দ, আলো-অন্ধকার মেশানো নানাগুণের একটি প্রাণী। আমি নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিলাম, আমার সমস্ত দোষ-গুণ, বাসনা-প্রবৃত্তি সমেত আমাকে গ্রহণ কর—তোমার যা খুশি তাই আমাকে নিয়ে কর।’’

### প্রকৃত সমর্পণ তোমাকে বড় করবে[২]

সমর্পণের এই অর্থ আমরা করি. . . একটা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদান অর্থাৎ তোমার সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া ভগবানের কাছে, একটা উচ্চতর চেতনার কাছে, যে চেতনার তুমি একটা অংশ মাত্র। সমর্পণ তোমাকে খর্ব করে না, বরঞ্চ বৃহৎ করে। এর দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব স্তিমিত বা দুর্বল কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, বরঞ্চ সুরক্ষিত হবে এবং নানা ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে। সমর্পণ হচ্ছে স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণ আত্মদান, তার ভিতরে আত্মদানের সমস্ত আনন্দটাই রয়েছে; কোন ত্যাগের ভাব এর ভেতরে নেই। তোমার যদি সামান্যতম বোধ হয় যে তুমি ত্যাগ করছ, তাহলে আর তা সমর্পণ হল না। তার মানে তুমি নিজেকে গুটিয়ে রেখেছ অথবা অনিচ্ছাসহকারে কিংবা কষ্ট ও চেষ্টা ক'রে দেবার প্রয়াস করছ এবং তাতে আত্মদানের আনন্দ নেই আর সম্ভবতঃ সেই বোধও নেই যে তুমি আত্মদান করছ। কোন কিছু করার সময়ে তুমি যদি সত্তার মধ্যে একটা চেপে-ধরা ভাব বোধ কর, নিশ্চয়ই তুমি কাজটা ভুলভাবে করছ বলে জানবে। সত্যিকারের সমর্পণ তোমাকে বাড়িয়ে তোলে, তোমার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; এর

দ্বারা গুণগত এবং পরিমাণগত দুভাবেই তুমি বেশি বেশি কার্যক্ষমতা পাবে, যা তুমি নিজে নিজে অর্জন করতে পারতে না। এই নতুন বৃহত্তম মাপের গুণ ও পরিমাণ, আগের থেকে একেবারে আলাদা জিনিস। তুমি একটা অন্য জগতে প্রবেশ কর, এমন একটা ব্যাপকতায় যাতে তুমি কিছুতেই পৌঁছতে পারতে না, যদি-না তুমি সমর্পণ করতে। এটা যেন সমুদ্রের মধ্যে পড়া এক বিন্দু জল—যদি এই বিন্দুটি নিজের আলাদা অস্তিত্ব রাখে, তবে সেটা এক বিন্দু জলই থাকবে, তার বেশি কিছু নয়—একটি ছোট বিন্দু, চারিদিকের অপরিমেয় বিশালতায় দলিতপিষ্ট, কেননা বিন্দুটা সমর্পণ করেনি। কিন্তু সমর্পণ করলে সেটা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সমগ্র সমুদ্রের প্রকৃতি, শক্তি ও বিরাটত্বের অংশ গ্রহণ করবে।

### সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্পণ[৩]

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমর্পণ হচ্ছে তোমার চরিত্রের সমর্পণ, তোমার জীবনভঙ্গিমার সমর্পণ, তবেই তার পরিবর্তন হতে পারে। যদি না তুমি তোমার একেবারে স্বভাবটাকেই সমর্পণ কর, তবে এই স্বভাব কোনদিনই পরিবর্তিত হবে না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার বোঝার কতকগুলি ধরন আছে, প্রতিক্রিয়া দেখানোর কতকগুলো ধরন, অনুভবের কতকগুলো ধরন, উন্নতি করার কতকগুলো প্রায়-নির্দিষ্ট ধরন এবং সর্বোপরি, জীবনদৃষ্টির একটা বিশেষ ভঙ্গিমা ও জীবন হতে বিশিষ্ট প্রত্যাশাসব—বেশ, এই হল সব জিনিস যা তোমাকে অবশ্যই সমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ তুমি যদি সত্যিই ভগবদালোক পেতে চাও এবং তোমার রূপান্তর চাও, তাহলে তোমার সত্তার সমস্ত গতিভঙ্গিমাকে অবশ্যই উৎসর্গ করতে হবে—উৎসর্গ করবে এসব খুলে ধরে এবং যথাসম্ভব গ্রহণশীল ক'রে যাতে ভগবৎ-চেতনা, যিনি জানেন তোমার কেমন হওয়া উচিত, সোজাসুজি কাজ করতে পারেন এবং তোমার 'সত্যকার সত্য'-এর সঙ্গে অধিকতর অনুগামী হয়ে এইসব গতিকে সত্যতর গতিসবে পরিণত করতে পারেন। একজন যা কিছু করে তা সমর্পণ করার চেয়ে এই সমর্পণ অনন্তগুণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একজন যা কিছু করে সেইটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নয় (যা কিছু করা হয় সেটা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা তো স্পষ্টই), বরঞ্চ সে নিজে কি তা-ই বিবেচ্য। যে কোন কাজই হোক, কিভাবে তা করা হচ্ছে ঠিক তা নয়, বরঞ্চ কোন্ চেতনায় করা হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কাজ করতে পার, ব্যক্তিগত কোন লাভের প্রত্যাশা না নিয়ে নিঃস্বার্থচিত্ত হয়ে, কাজের আনন্দেই কাজ, তবু তুমি যদি কাজটি ত্যাগ করতে কিংবা কাজটি পরিবর্তন বা তা করার ধরনটি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত না থাক, যদি তোমার নিজস্ব ধরনটাই আঁকড়ে থাক, তবে বুঝতে হবে তোমার সমর্পণ সম্পূর্ণ নয়। তোমাকে এমন একটা





অবস্থায় আসতে হবে যখন তুমি সমস্ত কিছু কর ভিতরে ভিতরে এই অনুভব কর ব'লে যে হ্যাঁ এটাই করতে হবে এবং এইরকম ভাবেই, আর তুমি করছ শুধু এই জন্যেই। এটি অনুভব করবে পরিষ্কারভাবে এবং বেশি বেশি একটা অবশ্যপালনীয় বোধ নিয়ে। তুমি করছ না কোন অভ্যাসবশত, কোন আসক্তি বা পছন্দজনিত, এমনকি কোন আদর্শের অনুগত হয়ে—যদিও-বা সেই আদর্শ অনুসরণ করা তোমার কাছে সর্বোত্তম বলে মনে হয়—নতুবা তোমার সমর্পণ পরিপূর্ণ নয়।

### যোগসাধনা ও উৎসর্গ[৪]

যোগসাধনা মানে ভগবানের সাথে যোগ এবং এই যোগ উৎসর্গের দ্বারা সাধিত হয়—নিজেকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করে দেওয়া, এই ভিত্তির উপর যোগসাধনা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে তুমি এই উৎসর্গ সাধারণভাবে আরম্ভ কর, যেন একবার করেই সব হয়ে গেল; তুমি বল: ''আমি ভগবানের দাস, আমার জীবন ভগবানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার সমস্ত প্রচেষ্টা হচ্ছে ভগবজ্জীবন উপলব্ধি করার জন্য।'' কিন্তু এটা হচ্ছে শুধু প্রথম পদক্ষেপ, কেননা এই-ই যথেষ্ট নয়। যখন মনঃস্থ করেছ, যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে তোমার সমস্ত জীবন ভগবানকে দেওয়া হবে, তখন এটা তোমাকে প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে এবং তোমার জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা ফলিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে তোমাকে অনুভব করতে হবে যে তুমি ভগবানের; প্রতি চিন্তায়, প্রতি কাজে তোমার সদাসর্বদা এই অনুভূতি হতে হবে যে ভগবানের চেতনাই সবসময়ে তোমার মধ্য দিয়ে কাজ করছে। তোমার আর কিছু থাকবে না যা তুমি নিজের বলতে পার; তুমি বোধ করবে যে সমস্ত কিছুই ভগবানের কাছ হতে আসছে এবং তোমাকে তা উৎসর্গ করে উৎসমূলে ফিরিয়ে দিতে হবে। তুমি যখন এ-কাজে সফল হয়েছ, তখন সামান্যতম জিনিসসবও, যেসব তুমি আগে মোটেই নজর দিতে না বা গ্রাহ্য করতে না, আর তুচ্ছ ও অর্থহীন থাকে না; সেসব অর্থবহ হয়ে ওঠে এবং সামনে একটা বিরাট দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়।

তোমার সাধারণভাবে করা উৎসর্গকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে হলে তোমাকে এই করতে হবে। সর্বদা ভগবৎসান্নিধ্যে বাস কর; এই অনুভব নিয়ে বাস কর যে এই সান্নিধ্যই তোমাকে চালায় এবং তোমার জন্য সবকিছু করছে। তোমার প্রতিটি গতিবৃত্তি উৎসর্গ কর তাঁর কাছে; শুধুমাত্র মনের কাজকর্ম নয়, প্রত্যেকটা চিন্তা, প্রত্যেকটা অনুভূতি নয়, এমনকি খুব সাধারণ এবং বাইরের কাজকর্মও, যেমন ধর খাওয়া-দাওয়া—সব উৎসর্গ কর। তুমি যখন খাবে, তোমাকে অনুভব করতে হবে ভগবানই তোমার মধ্যে দিয়ে খাচ্ছেন। তুমি যখন এইভাবে তোমার সমস্ত গতিবৃত্তি সংহত ক'রে একটা 'একমুখী জীবন' তৈরী করেছ, তখন জীবনে আর বিরোধ নেই, রয়েছে একতা। তখন

আর তোমার স্বভাবের একটি অংশ ভগবানকে প্রদত্ত, বাকিসব সাধারণ ভাব, সাধারণ জিনিসে নিমজ্জিত নয়; তোমার সমস্ত জীবন গ্রহণ করা হয়েছে এবং তোমার মধ্যে একটা সর্বাত্মক রূপান্তর ক্রমে ক্রমে সাধিত হচ্ছে।

পূর্ণযোগে পূর্ণজীবনটাকে এমনকি তার ক্ষুদ্রতম জিনিস পর্যন্ত রূপান্তরিত, দিব্যভাবান্বিত করতে হবে। রূপান্তরের কাজে কিছুই অর্থহীন, কিছুই তুচ্ছ নয়। তুমি বলতে পার না, "যখন আমি ধ্যান করছি, দর্শনশাস্ত্র পড়ছি কিংবা এইসব কথাবার্তা শুনছি, তখন আলোক গ্রহণ করার মতো উৎসর্গিত অবস্থায় থাকব এবং তা আহ্বান করব, কিন্তু যখন বেড়াতে বের হই কিংবা বন্ধুদের সাথে দেখা করি, তখন এইসব ভুলে যেতে আমার বাধা নেই।" যদি এইরকম মনোভাব তুমি পোষণ করতে থাক তাহলে তোমার রূপান্তর হবে না এবং কখনও যথার্থ ভগবন্মিলন হবে না। সর্বদা তুমি বিভক্ত থাকবে, বড়জোর মহত্তর জীবনের অল্পস্বল্প দেখা তোমার মিলবে। যদিও ধ্যানে কিংবা তোমার অন্তশ্চেতনায় বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি তুমি পেতে পার, কিন্তু তোমার শরীর, তোমার বহির্জীবন অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। যে অন্তর্জ্যোতি শরীর ও বহির্জীবনকে গণ্য করে না, তার বিরাট কিছু মূল্য নেই, কেননা তাতে জগৎটা যেমনকার তেমনই থেকে যায়।

**উৎস: ১, Cent.Edi.Vol. No.3, P.126, ২, Cent. Edi. Vol. No. 3, PP. 114-15, ৩, Cent. Edi.Vol. No. 4, P. 373, ৪, Cent. Edi. Vol. No. 3, PP. 23-24, অনুবাদ: পীযূষ গুপ্ত**

যাই ঘটুক না, ভাগবতী শক্তি সর্বদা পিছনে থেকে কাজ করে চলেছে—একদিন হয়ত যখন কোন রকম আশাই করা যায়নি,বাধা ভেঙ্গে যায়, মেঘ উড়ে যায়, ফিরে আবার দেখা দেয় আলো, ফুটে ওঠে সূর্য। সে রকম অবস্থায় সবচেয়ে ভাল হবে, যদি তা করতে পার, অস্থির না হওয়া, হতাশ না হওয়া—শুধু শান্তভাবে দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা, নিজেকে খুলে ধরা, প্রসারিত করা আলোর দিকে তার আগমনীর অপেক্ষায়। এতে আমি দেখেছি অগ্নি-পরীক্ষার কাল হ্রাস পায়।

শ্রীঅরবিন্দ

উৎস: *মাতৃবাণী*, অনুবাদ:নলিনীকান্ত গুপ্ত, পৃ:৯৯



# মায়ের উত্তর

(নির্বাচিত সংকলন)

মনগড়া ধারণা থেকে কি রকমে মুক্তি পাওয়া যায়?

প্রশান্ত মন পেলে। ১৫.৬.১৯৩৩

*

কোথা থেকে চিন্তাধারা আসে আর কেমন করে তারা কাজ করে?

অন্য সব কিছুর মতই চিন্তা আসে প্রকৃতি থেকে আর মনের মাঝেই তারা আকার গড়ে নেয়... ২৫.৮.১৯৩৩

*

মন, প্রাণ ও দেহ থেকে গুটিয়ে সরে আসা মানে কি?

মন প্রাণ ও দেহের গতিবিধির সঙ্গে নিজেকে এক করে না দেখা, তোমার বইয়ের বিষয়বস্তুকে তুমি যেমন করে লক্ষ্য করে থাক, এদেরও ঠিক সেইভাবে দেখবে... ১০.৯.১৯৩৩

*

মনে যে-সব চিন্তা আসে কিভাবে তাদের গতিরোধ করা যায়—যে সমস্ত চিন্তা প্রকৃতি থেকে আসে আর মনেতেই আকার লাভ করে?

তাদের প্রতিরোধ করতে গেলে কেবল এই দুটি উপায়ের একটির দ্বারাই তা করতে পার—

(ক) মনের মাঝে পরিপূর্ণ শান্তি এবং স্তব্ধতাকে নামিয়ে আনা।

(খ) মনের মধ্যে চিন্তা প্রবেশের আগেই তাদের সম্বন্ধে একটু দূরত্ব রেখে সচেতন হওয়া।

এটা যতদিন না পারছ তোমাকে ততদিন চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ১.৯.১৯৩৩

*

অজ্ঞানাচ্ছন্ন প্রাণকে কি করে জয় করা যায়—বলতে গেলে বলা যায়—এই অন্ধকার প্রাণকে আলোকিত প্রাণে কি করে পরিবর্তিত করতে হয়?

প্রাণের সমর্পণে। প্রাণকে আলোর দিকে উন্মুক্ত করে ধরা আর আপন চেতনার বিকাশ লাভ দ্বারা।

*

কখনও কখনও আমি সম্পূর্ণ চুপচাপ থাকি, কারও সঙ্গে একটি কথাও বলি না, কেবল

নিজের মধ্যে নিজে থাকি—ভগবানের কথা চিন্তা করি। এরকম মনোভাব কি সর্বদা বজায় রাখা ভালো?

এ রকম সুন্দর অবস্থায় সহজেই নিজেকে প্রশান্ত রাখা যায়—তবে এ যেন সত্যকার খাঁটি অবস্থা হয় অর্থাৎ আমি বলতে চাই এ অবস্থা যেন বাইরে থেকে শুধু শান্ত বলে মনে না হয়। সত্যকার গভীর প্রশান্ত ভাব যেন হয় যা তোমাকে আপনা থেকেই নীরব রাখে। ৯.৩.১৯৩৩

*

ভগবান আমার কাছ থেকে কি চান?

তিনি চান তুমি যেন সবার আগে নিজেকে ফিরে পাও—যা তোমার সত্যকার সত্তা, তোমার চৈত্যসত্তা, তোমার নিম্নতর সত্তার উপর যেন তুমি প্রভুত্ব ও শাসন করতে পার, তাহলেই তুমি এই বিরাট দিব্যকর্মে আপন যথার্থ স্থানটি স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করবে।

*

কোথায় আছে আমার সত্যকার সত্তা?

তা আছে তোমার নিজেরই আরও গভীরে কিংবা আরও ঊর্ধ্বে—আবেগ ইন্দ্রিয়ানুভূতির অপর পারে—তোমার মনের সীমানা ছাড়িয়ে।

*

মা, কি আছে এমন যা আমাকে সর্বদা মনে রাখতে সাহায্য করবে যে আমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছি?

সর্বদা এবং সর্ববস্তুর মধ্যে দিব্য উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনা।

*

যা কিছুই ঘটে তা প্রশান্ত হৃদয়ে আমি গ্রহণ করতে পারি না।

এটা অবশ্য যোগের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে মিলে যাওয়া আর তাঁকে জীবনে প্রকাশ করে ধরার মতো এমন বিরাট যার লক্ষ্য সে কেমন করে নানারকম তুচ্ছতা ও বোকামির দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারে?

*

মা, আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—কোন্ জিনিস আমার সত্তাকে দুভাগে ভাগ করে দেয়?

বিরোধের সময় যা তোমার মধ্যে চেতনার দিকে আকূতিপরায়ণ হয়, তোমার ‘‘সাত্ত্বিক’’ সত্তা এবং অচেতনার দ্বারা আক্রান্ত ও শাসিত হয় ‘‘তামসিক’’ সত্তা, এবং





যা তোমাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে ও নিম্নে নামিয়ে আনে আর ফলস্বরূপ যা বাইরের প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত...

*

মাগো, ভালোবাসার সেই উৎসকে কেমন করে পাব যা আমাকে বোঝাবে যে সর্বদা সর্বত্রই রয়েছে ভগবানের উপস্থিতি?

তোমার মাঝে সবার আগে পেতে হবে ভগবানকে—তাঁকে পেতে পার আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ও একাগ্রতায় কিংবা শ্রীঅরবিন্দ ও আমার প্রতি ভালোবাসা ও আত্মদানের মাধ্যমে...একবার যদি ভগবানকে পাও তাহলে সর্বত্র সর্ববস্তুর মধ্যে তুমি তাঁকে দেখবে।

*

মা, এমন কি যখন আমার এই দেহখানি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে তখনও আমি সাক্ষাৎ জীবন্তভাবে কেমন করে তোমাকে অনুভব করতে পারি?

তোমার আপন চিন্তার উপর অভিনিবেশ দ্বারা।

*

মমতাময়ী মা, সারাদিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও তোমার চরণে থাকতে পারি না—কেমন করে আমি বাঁচব তাহলে?

নিজের মাঝে ডুবে যাও, খুঁজে বের কর তোমার চৈত্যপুরুষকে—তাহলেই তুমি আমাকে খুঁজে পাবে—তোমার মাঝেই আছি—আমি যে তোমার জীবনের জীবন—চিরকাল রয়েছি তোমার মাঝে—তোমার খুবই কাছে আছি—একেবারে সাক্ষাৎ জীবন্তভাবে।

*

মা, যদি চৈত্যপুরুষ সদাই ভাগবত-উপস্থিতি অনুভব করে তাহলে কেন মানুষ কাঁদে, দুঃখ করে দিব্য-উপস্থিতির অভাবের জন্য?

তোমায় আগেই বলেছি—কেন না, বাইরের চেতনার সঙ্গে চৈত্য-চেতনার সংযোগ ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার মধ্যে এই যোগাযোগ ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সর্বদাই সুখী...

*

আদরের মধুময়ী মা আমার, আমি ‘মায়ের কথাবার্তা’ বই-এ পড়েছি যে ‘‘একমাত্র অভিনিবেশই তোমাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে’’—তাহলে কি ধ্যানের সময় বাড়ানো উচিত?

অভিনিবেশ অর্থ ধ্যান নয়। পক্ষান্তরে, অভিনিবেশ এমন এক অবস্থা যা বাইরের কাজকর্ম যাই হোক না কেন অবিরাম তা বজায় রাখা যায়...অভিনিবেশ বলতে আমি বুঝি—সমস্ত কর্মশক্তি,সমস্ত সংকল্প, সমস্ত আস্পৃহাকে কেবল ভগবানের দিকে চালিত

করতে হবে আর তার পূর্ণ উপলব্ধি চাই আমাদের চেতনায়... (ক্রমশ)

উৎস : **Cent. Edi.**, অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

## ''বিপরীত ভাবে, আমি তোমাদের বলি যে, পৃথিবীটা...অতি অন্ধকার...অতি অচেতন, দুঃখ দুর্দশায় ভরা, যন্ত্রণাগ্রস্ত বলেই সে হতে পারে আবার পরম সৌন্দর্য, পরম জ্যোতি, পরম চেতনা, পরম আনন্দ।'' —শ্রীমা

'' তুমি বলছ, 'আমি আমার ইচ্ছাটি ভগবানকে দিয়ে দিচ্ছি...ভগবৎ ইচ্ছায় এটা আমার মধ্যে ঘটুক।' তোমার ইচ্ছাটি অব্যাহতভাবে সক্রিয় থাকা চাই —বিশেষ কোন একটি কাজের দিকে না ঝুঁকে নির্দিষ্ট কোন একটি বস্তুর জন্যও কোন যাজ্ঞা না রেখে, বরং তা হোক তীব্র আস্পৃহার মত, যা সংহত হবে শুধুমাত্র অভিগম্য লক্ষ্যের দিকে।''

প্রশ্ন ও উত্তর ১৯২৯ (২১ শে এপ্রিল)

এবং এখানেই রয়েছে আমাদের সমস্যার সমাধান। প্রতি মুহূর্তেই তুমি তোমার ইচ্ছাটিকে অর্পণ করতে পার আস্পৃহার মধ্য দিয়ে যে আস্পৃহা অতি সহজেই রূপ নেয় শুধু এই ভাবেই নয়, ''ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক,'' বরং ''যেন আমার যতদূর সাধ্য সুন্দর করে করণীয় শ্রেষ্ঠ কাজটি করতে পারি।''

প্রতি মুহূর্তে তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নাও হতে পারে শ্রেষ্ঠ কর্তব্যটি কি, আর কেমন করেই-বা সেটি করতে হবে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাজটি ভগবানের কাছে নিবেদন করে দিতে পার। দেখবে ফল হবে অপূর্ব। এটা কর সজ্ঞানে, ঐকান্তিকতা আর ধৈর্যের সঙ্গে। তখন অনুভব করবে তুমি চলেছ বিরাট পদক্ষেপে। ব্যাপারটি এই রকমই, এটা করা চাই তোমার সত্তার সমস্ত আগ্রহ দিয়ে, তোমার ইচ্ছার সমস্ত শক্তি দিয়ে, প্রতি মুহূর্তে সব চেয়ে সুষ্ঠুভাবে শ্রেষ্ঠতম জিনিসটি করা চাই। অন্যে কি করছে তা তোমার বিবেচ্য নয়। জিনিসটি এমন যে তা যতবারই তোমাদের কাছে বলি না কেন— কখনো যথেষ্ট বলা হবে না।

কখনো বলো না, ''অমুক এটা করে না,'' ''অমুক অন্য কিছু করে,'' বা ''আর একজন এমন কিছু করে যা তার পক্ষে করা অনুচিত।'' এটা তোমার মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়। তোমাকে পৃথিবীতে একটি স্থূল দেহ দেওয়া হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য। সেটা হচ্ছে যতদূর সম্ভব এই দেহটিকে সচেতন করে তোলা—তাকে





ভগবানের সর্বাঙ্গসুন্দর এবং পূর্ণসচেতন যন্ত্র করে তোলা। তিনি তোমাকে কিছু পরিমাণ সারবান্ বস্তু, স্থূল পদার্থ মন প্রাণ দেহের সব ক্ষেত্রেই দিয়েছেন—যা তিনি তোমার কাছে প্রত্যাশা করেন সেই অনুপাতে, তুমি যখন যে অবস্থায় পড় তা ঘটেও তোমার কাছে তাঁর যে প্রত্যাশা সেই অনুপাতে। আর যেসব লোকে তোমায় এসে বলে, ''আমার জীবন দুর্বিষহ, পৃথিবীতে আমার জীবনই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর।'' তারা একেবারে নিরেট মূর্খ। প্রত্যেকের জীবন হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ উন্নতির উপযোগী, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাগুলি তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপোষক এবং প্রত্যেকের বাধাগুলোও তার পূর্ণসিদ্ধির সহায়ক।

তুমি যদি একাগ্র হয়ে নিজেকে লক্ষ্য কর তাহলে দেখতে পাবে যে গুণটি তোমাকে অর্জন করতে হবে তোমার মধ্যে সর্বদা তার বিপরীতটি বর্তমান (গুণ বলতে আমি তার বৃহত্তম এবং উচ্চতম অর্থে ধরছি)। তোমার একটি বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে—একটি বিশেষ ব্রত রয়েছে, রয়েছে একটি বিশেষ সিদ্ধি যেটা শুধু তোমারি নিজস্ব। এটা রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের। আবার তোমার ভিতর রয়েছে সেই সব বাধাবিঘ্ন যেগুলি তোমার সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়। সর্বদা দেখবে তোমার ভিতরে আলো আর ছায়ার খেলা চলেছে পাশাপাশি। তোমার যেমন কোন ক্ষমতা তেমনি সেই ক্ষমতার বিপরীতটিও রয়েছে। কিন্তু তুমি যদি খুব কালো কোন গর্ত আবিষ্কার কর, কোন গাঢ় ছায়া, তুমি নিঃসংশয়ে জানবে যে তোমার ভিতরে কোথাও রয়েছে একটি বিরাট আলো। একটির সিদ্ধির জন্য অন্যটির প্রয়োগবিধি—সেটা তোমাকেই বের করতে হবে।

বিষয়টি অতি স্বল্প আলোচিত কিন্তু তার গুরুত্ব অপরিমেয়। তোমার যদি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সর্বদা এরকমই হয়ে থাকে। এই জন্যই আমরা স্ববিরোধী জিনিস বলি কিন্তু তা অবিসংবাদী সত্য, যেমন সবচেয়ে বড় চোর সব চেয়ে বড় সাধু হতে পারে (তবে মনে ক'রো না চৌর্যবৃত্তিতে তোমাদের আমি উৎসাহ দিচ্ছি)। আর যে সব চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী সে হতে পারে সবচেয়ে খাঁটি সত্যবাদী। সুতরাং তোমার মধ্যে যদি হীনতম দুর্বলতা দেখ তাতে নিরুৎসাহ হয়ে পড় না, কারণ সেটিই হয়তো সবচেয়ে বড় দিব্যশক্তির চিহ্ন। কখনো বলো না, ''আমি তো এরকমই, আমার পক্ষে অন্য রকম হওয়া সম্ভব নয়।'' এটা সত্য নয়। তুমি, ''এই রকম'' ঠিক এই কারণে যে তোমাকে তার বিপরীতটি হতে হবে। তোমার বাধাবিপত্তিগুলিও ঠিক এই জন্য যে সেগুলিকে তুমি তাদের লুকিয়ে রাখা সত্যে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করবে।

একবার এটা বুঝতে পারলে অনেক ভাবনারই নিরসন হয় আর তখন তুমি হয়ে ওঠ দারুণ খুশি—দারুণ খুশি। তুমি যদি তোমার কালো গর্তগুলো সম্বন্ধে সজাগ হয়ে

থাক তাহলে মনে মনে বলো, "এটা প্রমাণ করছে যে আমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারি।" আর খাদটি যদি হয় অতি গভীর: "আমি অনেক অনেক উঁচুতে উঠতে পারি।" বিশ্বজাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপারটি এই রকমই। তোমাদের পরিচিত হিন্দু পরিভাষা অনুসারে বৃহত্তম অসুরেরা হচ্ছে আলোর বৃহত্তম সব সত্তা। যেদিন এই অসুরেরা পরিবর্তিত হবে সেদিন তারা হবে সৃষ্টির মহত্তম সত্তা। তা বলে তোমাদের আসুরিক হতে উৎসাহ দেওয়া মোটেও আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ব্যাপারটি এরকমই। এটা তোমাদের মস্তিষ্ককে একটু প্রসারিত করে দেবে, ভালমন্দের বিরোধগত ধারণাগুলি থেকে তোমাদের মুক্তি দিতে সাহায্য করবে, কারণ তুমি যদি এই শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত হতে চাও তাহলে আর আশা নেই।

জগৎ যা হয়েছে সে যদি মূলত তার বিপরীত না হ'ত তাহলে কোন আশাই থাকত না। কারণ গর্তটি এত কালো এত গভীর অচেতনা এত সামগ্রিক যে এটা যদি সমগ্র চেতনার লক্ষণ না হ'ত তাহলে বোঁচকা বেঁধে সরে পড়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। শঙ্করের মত মানুষেরা যাদের দৃষ্টি তাদের নাসাগ্রের চেয়ে বেশি দূরে যেত না তারা বলতেন যে, পৃথিবীটা বসবাস করবার মত উপযুক্ত স্থান নয়। কারণ এটা একটা অসম্ভব জিনিস, এটাকে মায়া বলে মনে করে এখান থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল! এটাকে নিয়ে আর করবার কিছু নেই। বিপরীতভাবে, আমি তোমাদের বলি যে, পৃথিবীটা অতি খারাপ জায়গা, অতি অন্ধকার, অতি কুৎসিত, অতি অচেতন, দুঃখদুর্দশায় ভরা, যন্ত্রণাগ্রস্ত বলেই সে হতে পারে আবার পরম সৌন্দর্য, পরম জ্যোতি, পরম চেতনা, পরম আনন্দ।

**উৎস:*Question and Answers,* Cent, Edi.**

ভগবান, তোমার সম্মুখে আমি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে ছিলাম অন্তরে নিজেকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে, জ্বলন্ত আরাধনায় পূর্ণ হয়ে, পরম একাত্মতার জন্যে উন্মুখী হয়ে।...চিরদিন যেমন, তুমি আমায় বললে: "পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর।" আমি দেখলাম পথ সব উদার উন্মুক্ত, প্রশান্ত বিশুদ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত।

মূক আরাধনায় মগ্ন হয়ে, তোমার ইচ্ছাতে ওতপ্রোত হয়ে, আমি পৃথিবীর দিকে ফিরে দাঁড়ালাম।

শ্রীমা

উৎস: *Prières et Méditations,* অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত



**"সে একটা যুগ গেছে, যখন মানুষ ছিল নিরক্ষর মেষপালক, ...তার ভেড়ার পালের সঙ্গে তারাভরা আকাশের নিচে শুয়ে শুয়ে রাত কাটাত আর সেই তারাগুলোর মাঝে কি লেখা আছে তা পড়ে, কি ঘটতে চলেছে তা সে বুঝতে পারত।... তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ, আর ছিল সেই অপূর্ব শান্তি, যেটাই হল জীবনের সরলতার উৎস।"** —শ্রীমা

অপ্রমত্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, আনন্দলাভ করেন, এবং আর্যদের পথ অনুসরণ করেন। (ধম্মপদ, ২২)

এই উপদেশটির মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি বিষয় লক্ষ্য করবার রয়েছে, কোথাও একটিবারও বলা হয় নি জীবনে ভাল করে বাঁচতে হলে, ভাল করে চিন্তা করতে হলে, চেষ্টা করার দরকার বা স্বার্থ বিসর্জন করার দরকার, বরং বলা হয়েছে, সর্বদা আনন্দময় অবস্থায় বাস করতে পারলেই সকল দুঃখকষ্টের অবসান হয়। তখনকার দিনে, বুদ্ধদেবের আমলে, আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করাটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার, ছিল স্বর্গ-সুখ উপভোগের, এবং পূর্ণ পরিতৃপ্তির অবস্থা, আর ছিল পৃথিবীর সকল রকমের দুর্ভাবনার, দুঃখকষ্টের, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের উপায়। মানুষের তাতেই ছিল সুখ, শান্তি, পরিতৃপ্তি।

এখনকার দিনের জড়বাদই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়াসকে করে তুলেছে এক অতি কষ্টকর প্রচেষ্টার ব্যাপার। যেন এ এক আত্মবলিদান, জীবনের তথাকথিত সকল সুখভোগের বদলে এক নির্মম নিপীড়ন।

এই বাহ্য জগৎটাই হল একান্তভাবে সত্য, জিদ করে এই মনোভাবকে ধরে থাকা, দেহগত যত সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর উপভোগ এবং পার্থিব নানা সম্পত্তির অধিকার নিয়েই ব্যস্ত থাকা—এ হল মানব সভ্যতার জড়ধর্মী সমগ্র প্রবৃত্তির ফল। তখনকার দিনে এ ধারণা ছিল চিন্তার অতীত, উলটে বরং নির্জন বাস, ধ্যান ধারণা, সকল বৈষয়িক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দে একনিবিষ্ট হওয়া, প্রভৃতিই ছিল সৌভাগ্যের লক্ষণ।

সে দিক থেকে, এ একেবারে অতি প্রত্যক্ষ যে, মানবজাতি উন্নতির পথে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ে আছে, আর এখনকার দিনে যারা পৃথিবীতে জড়বাদী সভ্যতার এই সব কেন্দ্রে জন্মেছে, তাদের অবচেতনায় এই ভয়াবহ বস্তুটি জায়গা দখল করে বসে

আছে, যে কেবল স্থূলের সত্যগুলিই হল যথার্থ, আর যা কিছুই তা নয় সে সবের প্রতি আত্মনিয়োগ করা হল, চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগের মনোবৃত্তির এবং প্রায় মহিমাময় প্রয়াসের লক্ষণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত, যত রকমের বাহ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর পরিতৃপ্তি নিয়ে যে ব্যস্ত না থাকে, ইন্দ্রিয়গত যত অনুভূতি আর বাহ্য ক্রিয়াকলাপ নিয়ে যে মত্ত না হয়, তার মন যে বিস্ময়করভাবে অদ্ভুত, তারই প্রমাণ ওগুলো। লোকে এটা বুঝতে পারে না, কিন্তু আধুনিক সমগ্র সভ্যতারই ভিত্তি এই ধারণা। এ সভ্যতার মর্মকথা হল, ''অবশ্যই যাকে ধরা ছোঁয়া যায় তা একেবারে নির্ঘাত সত্যি, যা চোখে দেখা যায় নিঃসন্দেহেই তা সত্যি, খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণ করে মানুষ নিশ্চিত, যে সে তা খেয়েছে, কিন্তু আর বাকি যা কিছু সে সবের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সেগুলো যে অলীক স্বপ্ন মাত্র নয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? আর আমরা যে আসল জিনিসকে ছেড়ে কল্পনার পিছনে ছুটছি না, ছায়াকে কায়া বলে ধরতে যাচ্ছি না, তাই-বা কি করে বুঝব আর শেষ পর্যন্ত, ও সবের পিছনে ছুটে লাভটাই-বা কি? কিছু স্বপ্নদর্শন, তাছাড়া আর ত কিছুই নয় তার চেয়ে বরং পকেটটা যদি ভারী করতে পার, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহ যে তোমার কিছু আছে''।

আর সর্বত্রই ওই মনোভাব, সকল কিছুর পিছনেই ওই। বাইরের আড়ম্বরটা একটু ঘসলেই দেখবে, তোমার চেতনার মধ্যে ওটি রয়েছে, আর মাঝে মাঝে শুনতে পাবে, ওটি তোমার কানে কানে বলছে, ''দেখো হে, সাবধান, শেষ পর্যন্ত যেন ঠকে যেও না...'' সত্যিই, এ অতি শোচনীয়...।

লোকে বলে, বিবর্তন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে, আর ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করে সর্পিল রেখায় ঊর্ধ্বে উঠে চলেছে। আধুনিক বড় বড় শহরগুলোতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলতে এখনকার দিনে যা বোঝায়, আগেকার গুহাবাসী মানুষের তুলনায়, তা যে ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে খুবই উন্নত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু প্রাচীনকালের গল্পে ইতিহাসে প্রায়ই বলত, তখনকার লোকেদের দূরদৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো মন ছিল, অলৌকিক দৃষ্টির দ্বারা ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তারা সে কথা বলতে পারত, খুব সূক্ষ্ম কোন বস্তুর সঙ্গে তাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, আর এই সবই সে যুগের সরল মানুষদের কাছে ছিল প্রত্যক্ষ বাস্তব।

এখনকার দিনের অতিমাত্রায় সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় সুন্দর শহরগুলিতে লোকে যখন কোন কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায়, তখন তারা কি বলে? '' ও হল স্বপ্নবিলাস, স্রেফ কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।''

আর সত্যিই, যে মানুষ জীবনে অন্তর্মুখী হয়ে বাস করে, লোকেরা তাকে একটু বাঁকা চোখে দেখে, ভাবে, লোকটার মাথায় ছিট নেই ত যে সারাক্ষণ কেবল টাকার ধান্দায় ঘুরে বেড়ায় না! সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ছটফট না করে, পদমর্যাদা





লাভের জন্যে, সমাজে গণ্যমান্য হবার চেষ্টায় উঠে পড়ে না লাগে, সাধারণত লোকেরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, মনে মনে ভাবে, লোকটার মন সাচ্চা ত!

আর সমস্ত আবহাওয়াটাই এইতে ভরে আছে, প্রতিটি শ্বাসে প্রশ্বাসে মানুষ এই হাওয়াই আত্মসাৎ করছে, অন্যদের সঙ্গে আলাপে আলোচনায় এ ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই, তাতে ব্যাপারটা দিব্যি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এ যে একেবারে মূঢ়তার চরম, তা একবারও মনে উদয় হয় না।

নিজের সম্বন্ধে আরও খানিকটা সচেতন হওয়া, বাহ্য আকারের পিছনে যে জীবন রয়েছে তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারাই যে জীবনের সকল সম্পদের তুলনায় সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য, তা তোমাদের মনেই হয় না। নানা রকমের সুখাদ্যে সাজানো টেবিলের সামনে সুন্দর একটা চেয়ারে আরাম করে বসে, যখন লোভনীয় আহার্যে উদর পূর্তি কর, অবশ্যই তখন সেটাকে ঢের বেশী বাস্তব, আর ঢের বেশী উপভোগ্য বলে বোধ হয়। যে দিনটা কেটে গেল তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে যদি পুরো দিনের হিসেব নিকেশ করে দেখ তাহলে পার্থিব সুযোগ সুবিধা যদি কিছু পেয়ে থাক, আমোদ-প্রমোদের এবং দেহের পরিতৃপ্তির মতন যদি কিছু লাভ করে থাক, তাহলেই সে দিনটা তোমার কাছে বেশ স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কিন্তু জীবনে যদি একটা ভাল কিছু শিখে থাক, তুমি যে একটি নির্বোধ ব্যক্তি, তার প্রমাণস্বরূপ যদি গালে একটি চড় খেয়ে থাক, তাহলে কখনই সে দিনটাকে তুমি জীবনের একটা শুভ দিন ভেবে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না। তুমি বলবে, ''উঃ বেঁচে থাকাটা সব সময়েই একটা তামাশা নয়!''

এই প্রাচীন উপদেশ বাক্যগুলি পড়তে পড়তে আমার ঠিক এই কথাই মনে হয়, অন্তরের দিক থেকে, সত্যিকারের জীবনের দিক থেকে, বাস্তবিকই মানুষ সাংঘাতিক রকম সরে গেছে। কয়েকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক যন্ত্রপাতি অর্জন করতে গিয়ে, আর দেহের কুঁড়েমিকে কিছুটা প্রশ্রয় দিতে গিয়ে এমন সব কলকব্জা অথবা যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে, জীবনযাত্রায় যেগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষের খাটা-খাটুনির দিকটাকে অত্যন্ত সহজ করে ফেলেছে, কিন্তু তার ফলে মানুষ তার অন্তর্জীবনের সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এইটা বুঝতে পারার ক্ষমতা মানুষ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। জীবন বলতে কি বোঝায়, মানুষের বেঁচে থাকার মূল উদ্দেশ্যটা কি, কোন্ লক্ষ্যের দিকে আমাদের এগিয়ে চলা দরকার—যে দিকে তোমরা চাও বা না চাও, সমগ্র মানবজীবনই এগিয়ে চলেছে, এখন জানবার কথা মনে করতেও, তোমাদের চেষ্টা করতে হবে। এখনকার দিনে লক্ষ্যের দিকে এক পা এগুতে গেলেই আর রক্ষা নেই, প্রচুর মেহনত করতে হবে। আর সাধারণত, যখন বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায় তখনই মানুষ ও-কথা ভাবে।

সে একটা যুগ গেছে, যখন মানুষ ছিল নিরক্ষর মেষপালক, কোনদিন লেখাপড়া

শেখে নি, তার ভেড়ার পালের সঙ্গে তারাভরা আকাশের নিচে শুয়ে শুয়ে রাত কাটাত, আর সেই তারাগুলোর মাঝে কি লেখা আছে তা পড়ে, কি ঘটতে চলেছে তা সে বুঝতে পারত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, এমন কিছুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ, আর ছিল সেই অপূর্ব শান্তি, যেটাই হল জীবনের সরলতার উৎস।

সত্যিই এ বড় আফশোষের বিষয় যে, একটা জিনিসকে পেতে গিয়ে আর একটাকে বর্জন করতে হল। আমি তোমাদের কাছে অন্তর্জীবনের কথা বলছি বলে ভেব না যে, বর্তমানের যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে আপত্তি করছি, মোটেই তা নয়, বরং বলি, এ সবের খুবই প্রয়োজন আছে। কেবল বলছি, এই আবিষ্কারগুলো আমাদের কি পরিমাণেই না কৃত্রিম আর আহাম্মুক করে তুলেছে। কি ভাবে আমরা যথার্থ সৌন্দর্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছি, আর কি পরিমাণে আমরা যত বাজে প্রয়োজনের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি।

হয়ত এখন সময় এসেছে যখন উর্ধ্বপথের সর্পিল ধারায় আমাদের আবার এগিয়ে যেতে হবে, আর এই জড়ের জ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা কিছুই লাভ করেছি, তাই দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারব। জড় প্রকৃতির গোপন রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা কিছু শিখতে পেরেছি, সেগুলোর দ্বারা বলীয়ান হয়ে এবার আমরা দুই বিপরীত প্রান্তকে সংযুক্ত করতে পারব, এবং হয়ত পরমাণুর একেবারে হৃৎকেন্দ্র সর্বোত্তম সত্যকে আবার খুঁজে পাব।

**উৎস:*On the Dhammapada***

আমাদের সমস্ত জীবন হয় যেন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একখানি প্রার্থনা।

শ্রীমা

উৎস: *মাতৃবাণী*, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত



# আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন

**শ্রীঅরবিন্দ**

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১-এর পর)

...আধুনিক সমাজ বেঁচে থাকার বা উদ্বর্তনের একটি নতুন নীতি আবিষ্কার করেছে যা হল অগ্রগতি, কিন্তু সেই অগ্রগতির লক্ষ্য তা কদাপি আবিষ্কার করেনি—যদি না সেই অগ্রগতির লক্ষ্য সর্বদাই আরও জ্ঞান, আরও সাজসরঞ্জাম, আরাম ও আয়াস, আরও উপভোগ, সামাজিক অর্থনীতির উত্তরোত্তর অধিক জটিলতা, উত্তরোত্তর অধিক বাহুল্যবিজড়িত অতি ধনাঢ্য জীবন হয়ে থাকে। কিন্তু এইগুলি শেষ পর্যন্ত যেখানে পুরাতন ব্যবস্থা নিয়ে গিয়েছিল, সেইখানে নিয়ে যাবে কেন না এগুলি আরও বৃহত্তর আকারে একই জিনিসমাত্র, এগুলির গতি চক্রাকারে অর্থাৎ কোনখানেই এগুলি পৌঁছায় না, এগুলি জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ, নিত্য নবসৃষ্টির দ্বারা নিজেদের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার রহস্য খুঁজে পাওয়া যায় না, যা হল অমরত্বের নীতি, কেবল একাদিক্রমে কতকগুলি মিথ্যামায়াময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ক্ষণিকের জন্য অমরত্ব পেয়েছে বলে মনে করে যেগুলির প্রতিটির পরিণতি নিরাশায়। এখনও পর্যন্ত এটাই হল আধুনিক অগ্রগতির স্বরূপ। কেবল একটি অন্তর্মুখী নতুন দিক্‌পরিবর্তনে, অধিকতর বিষয়ীগত (subjective) ভাবের দিকে ঘুরে যাওয়ার প্রবণতায়, যার সবেমাত্র সূচনা হয়েছে, আমরা অধিকতর আশার সন্ধান পাই, কারণ ঐ দিক্‌পরিবর্তনের দ্বারা তা হয়তো আবিষ্কার করবে যে মানুষের প্রকৃত সত্যটি পাওয়া যাবে তার আত্মায়। অবশ্য বিষয়ীগত যুগ যে আমাদের সেখানেই নিয়ে যাবে তা সুনিশ্চিত নয়; কিন্তু আমরা এই সম্ভাবনাটি দেখি যে—অধিকতর অন্তর্মুখী গতিটি, যদি যথাযথ ভাবে কাজে প্রয়োগ করা হয়, তবে সেইদিকে ঘুরে যেতে পারে।

লোকে হয়তো একথা বলবে যে এ তো পুরানো আবিষ্কার, ধর্ম নামে তা অভিহিত এবং প্রাচীন সমাজ তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কিন্তু তা ছিল আপাত সত্য মাত্র। আবিষ্কারটি করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা করা হয়েছিল কেবল ব্যষ্টির জীবনের জন্য এবং সেক্ষেত্রেও চরিতার্থতার জন্য পার্থিব জীবনের পরের লোকের দিকে দৃষ্টি রাখত এবং পৃথিবীকে কেবল একক মুক্তি বা জীবনের বোঝা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রস্তুতির স্থান হিসাবে দেখত। আত্মার আবিষ্কারকে মানবসমাজ নিজের সত্তার নীতিকে আবিষ্কারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করবে কিংবা আত্মার সত্যিকার প্রকৃতি, আত্মার প্রয়োজন এবং আত্মার চরিতার্থতা লাভের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞানকে পার্থিব জীবনে পূর্ণ-সৌষ্ঠবতা আনার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা যাবে এরূপ ভাবনা মানবসমাজ কখনও গ্রহণ করেনি। ব্যষ্টির প্রতি প্রয়োগের দিকটি না দেখে যদি আমরা পুরাতন

ধর্মগুলির সমাজের সমষ্টির প্রতি প্রয়োগের বিষয়ে নজর দিই, তবে আমরা দেখি যে সমাজ তাদের যেভাবে ব্যবহার করেছিল তা ছিল ধর্মের সবচেয়ে আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত দিক্‌গুলি কিংবা বড়জোর ধর্মের কম আধ্যাত্মিক অংশগুলি। সমাজ পুরাতন ধর্মগুলিকে, সমাজের যাবতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা অতি উচ্চ ও ভয়প্রদ অনুমোদন দেবার জন্য (আর এই সব অনুমোদন কালে স্থায়ী অনুমোদনে পরিণত হবে) ব্যবহার করেছিল; সমাজ সেগুলিকে মানুষের অনুসন্ধিৎসার বিরুদ্ধে রহস্যজনক যবনিকা রূপে এবং নতুন পথ প্রবর্তনকারীর বিরুদ্ধে অন্ধকারময় প্রতিরোধরূপে পরিণত করেছিল। ধর্মের মধ্যে মানুষের মুক্তির ও সুসম্পূর্ণতার যে পন্থাটি তা দেখতে পেয়েছিল সমাজ তাকে তৎক্ষণাৎ যান্ত্রিক নিয়মে পরিবর্তিত করার জন্য, মানুষের আত্মাকে ধরে সামাজিক-ধর্মীয় যন্ত্রের চাকার সঙ্গে বেঁধে দেবার জন্য, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পরিবর্তে তার উপর এক প্রভুত্বব্যঞ্জক জোয়াল ও লৌহ কারাগার চাপিয়ে দেবার জন্য তাকে হস্তগত করেছিল। মানুষের ধর্মীয় জীবনের উপর তা গীর্জা, পুরোহিতবর্গ ও যাবতীয় অনুষ্ঠানের লটবহর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং সেগুলির উপর নজর রাখার জন্য আচার ও শাস্ত্র এই নামে একদল প্রহরী নিযুক্ত করে দিয়েছিল, যে সব শাস্ত্র সকলকে গ্রহণ করতে ও মানতে হবে তা নয়তো পরলোকে চিরন্তন বিচারক অনন্ত নরকে তাকে নিক্ষেপ করবে, ঠিক যেমন মর্ত্যলোকে সামাজিক নিয়মগুলিকে মেনে চলতে হয় নতুবা মরদেহধারী বিচারকের দ্বারা কারারুদ্ধ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। মানবজাতিকে ধর্মের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করার সর্বদাই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল ধর্মের এই মিথ্যাচারপূর্ণ সামাজিক রূপায়ণ।

কারণ ধর্মের পক্ষে বাইরের সহায়গুলি, বহিরঙ্গ ও ক্রিয়াপদ্ধতিগুলির চাপে, তার আধ্যাত্মিক উপাদানটি নিষ্পেষিত হয়ে বা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে লুপ্ত হওয়ার থেকে অধিকতর মারাত্মক ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রয়োগ যেভাবে করা হয়েছিল তা যে কতটা ভ্রান্ত তা তার ফলাফল থেকে বোঝা যায়। ইতিহাস একাধিকবার প্রত্যক্ষ করিয়েছে যে ধর্মপ্রবণতার উচ্ছ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা যখন সবচেয়ে বেশি সেই একই সময়ে এসেছে সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞতা, মালিন্য এবং মনুষ্য জীবনে জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় অনগ্রসরতা, সাথে সাথে নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও উৎপীড়নের অবিসংবাদী রাজত্ব কিংবা অত্যন্ত সাধারণ, আস্পৃহাহীন, অনুন্নত মানের জীবনযাত্রা যার উপর কোন বুদ্ধিবৃত্তিগত বা আধা-আধ্যাত্মিক আলোকের স্পর্শের দ্বারা উপশম প্রায় ছিল না, আর যেসবের পরিণতি ব্যাপক বিদ্রোহ যা সর্বপ্রথম সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল, কারণ সেই ধর্মের ভ্রান্ত প্রয়োগের উপর ভিত্তি করেই অসত্য, অশিব ও অজ্ঞানতা রাজত্ব করছিল। ব্যর্থতার আর একটি লক্ষণ হল এই যে একটি সামাজিক-ধর্মীয় নিয়মকানুনের প্রণালীর ও তার আচার





অনুষ্ঠান ও বহিরঙ্গ খুবই নিখুঁতভাবে অতিরিক্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করা—আর এইভাবে ভুল জায়গায় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তাদের অর্থ ও সত্যিকার ধর্মীয় মূল্য বিনষ্ট হতে থাকে—এবং ব্যক্তির ও জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির স্থলে ঐগুলিই ধর্মের নীতি ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়ে পড়ে। এই ব্যর্থতার আর একটি বিরাট লক্ষণ এই যে ব্যষ্টি তার আধ্যাত্মিক বিকাশের উপযুক্ত স্থল খুঁজবার জন্য সমাজ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়; যখন দেখে যে মনুষ্যজীবন অশুদ্ধ মন, প্রাণ ও দেহের মধ্যে আবদ্ধ এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার স্থলে রয়েছে বহিরঙ্গের, গীর্জার, শাস্ত্রের ও কোনও অজ্ঞানতার নীতির বাঁধন তখন সে এসব ছেড়ে দিয়ে মঠে, পর্বতশিখরে, গুহায়, মরুভূমিতে ও অরণ্যে চলে গিয়ে সেখানে আত্মার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। যখন জীবন ও আত্মার মধ্যে এই বিভেদ দেখা দেয় তখন বুঝব মানুষের জীবন ধিক্কারযোগ্য হয়ে গিয়েছে। তখন হয় জীবন তার দৈনন্দিনতার আবর্তের মধ্যে পড়ে থাকে নয়তো তাকে অকিঞ্চিৎকর ও অলীক ব'লে, দম্ভে ও অধিকতর দম্ভে পূর্ণ ব'লে তাচ্ছিল্য করে এবং জীবন নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে—তার পার্থিব নিয়তির প্রতি আন্তর বিশ্বাস—যাকে বলা হয় শ্রদ্ধা—হারিয়ে ফেলে, যে শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে তা কিছুই সাধন করতে পারে না। কারণ মানব-আত্মায় ঊর্ধ্বে যাওয়ার কষ্টসাধ্য প্রয়াস থাকতে হবে; তার প্রয়াসের চাপ হারালে জাতি নিশ্চয়ই অচল ও অনগ্রসর হয়ে যাবে কিংবা এমনকি অন্ধকারে ডুবে যাবে ও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি জীবন আত্মাকে পরিবর্জন করে বা আত্মা জীবনকে পরিবর্জন করে তবুও আন্তর সত্তা জেগে উঠে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, হয়তো আধ্যাত্মিকতার দ্বারা লালিত ভূমিতে একদল গৌরবোজ্জ্বল সাধুসন্তের আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জাতি, সমাজ ও দেশবাসী যদি জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত করার দিকে চালিত না করে বা কোন আদর্শের আলোকের দ্বারা চালিত হয়ে অগ্রসর না হয়, তবে পরিণাম হবে ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা ও গতিহীনতা। তা নয়তো জাতিকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির শরণ নিতে হবে, বুদ্ধিবৃত্তির কাছে কোন নতুন আদর্শ বা আশার সন্ধান করতে হবে এবং বিচারশীল যুগের মধ্যে দিয়ে চক্রাকারে পরিক্রম ক'রে আধ্যাত্মিক সত্যকে নতুন কোন রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যমে এবং মানবজীবনকে আধ্যাত্মিকতায় পরিবর্তিত করার নতুন প্রচেষ্টায় ফিরে আসতে হবে। (ক্রমশ)

**উৎস: *The Human Cycle*, অনুবাদ: মনোজ ভট্টাচার্য**

# প্রাণের রূপান্তর

**শ্রীঅরবিন্দ**

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১-এরপর)

অহং-এর গতিবৃত্তিগুলি থেকে সহসা মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। এক নিরবচ্ছিন্ন চেতনা ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রকৃতি হতে তাদের নিঃশেষিত হতে হয়। এমনকি যখন কেন্দ্রীয় অহং অন্তর্হিত হয়, অভ্যাসগত গতিবৃত্তিগুলি তখনও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আঠার মত লেগে থাকে।

*

চৈত্যপুরুষের মুক্তি এবং যথার্থ পুরুষের উপলব্ধি ব্যতিরেকে অহং-এর প্রস্থান সম্ভবপর নয়, উভয়েই অপরিহার্য। যদি সেখানে পুরুষের কোন চেতনা উপস্থিত না থাকে, তাহলে অহং কিভাবেই-বা অন্তর্হিত হবে? প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে চৈত্যপুরুষের মুক্তি আসতে পারে বটে, কিন্তু একটি ঘটনার বিষয়ে আমি বলছি যেখানে চৈত্য অতখানি মুক্ত না থাকলেও পুরুষের উপলব্ধি ঘটা সেক্ষেত্রে অনেকখানি সহজসাধ্য ছিল।

*

হ্যাঁ। যদি তুমি অন্তরের গভীরে পৌঁছে থাক, তাহলে চৈত্যিক বিকাশ সহজতর হয়ে উঠবে এবং সেইসঙ্গে অহংকে জয় করা—অনুরূপভাবে চেতনার প্রসারণও ঘটবে।

*

অহং-এর থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য উচ্চতর চেতনার তুলনায় বরং এক প্রসারিত চেতনা হল অপরিহার্য—চেতনার ঊর্ধ্বে আরোহণ অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা নিজে যথেষ্ট নয়।

*

যদি অহং-এর প্রস্থান ঘটে এবং পূর্ণ সমর্পণের উপস্থিতি থাকে, তাহলে আর কোন প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব থাকবে না। তৎসত্ত্বেও যদি কেবলমাত্র প্রাণময় রজ শান্ত হয়ে ওঠে, তাহলে এর শান্ত অবস্থা রজের স্থানে তমকে স্থাপন করতে পারে এবং তখন সেটিই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

*

বিশ্বজনীনতা একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তখন আর প্রকৃতির মধ্যে প্রাণিক আত্মপরতার জন্য কোন সুরক্ষিত দুর্গের অস্তিত্ব থাকে না—দুর্গের প্রাচীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে। তখনও পর্যন্ত তারা [অহমাত্মক প্রাণময় গতিবৃত্তি] বাইরে থেকে আক্রমণ করতে পারে বটে, কিন্তু বর্তমানে সাধকের মাঝে আর কোন স্থায়ী গঠন গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে





তাদের বাধা দেওয়ার ব্যাপারটি সাধকের শক্তির উপরেই নির্ভর করে থাকে।

*

শুধুমাত্র স্থিরতার উপস্থিতি কদাচিৎ যথেষ্ট বলে পরিগণিত হতে পারে। সেখানে অবশ্যই এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে হবে যা প্রাণের মধ্যে থেকে অহংকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

*

সে [অহং] উত্থিত হয়ে ওঠে কেননা তেমনটি করাই হল তার স্বভাবধর্ম; সে চায় সত্তাকে অধিকার করে নিতে, তার বিবেচনা অনুযায়ী যা হল তারই সম্পত্তি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করবার ক্ষেত্র।

*

অবশ্যই, তারা [অহং ও প্রাণময় সত্তা] ওদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য একটি চাপকে প্রতিরোধ করে থাকে—আর যদি একজন একটি নির্দিষ্ট সময়কে স্থির করে নেয়, তখন সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটিকে সম্পন্ন করে তুলবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আগমন ঘটলে, হতাশা এবং নিরুৎসাহ সৃষ্টি করে তুলবার আশায় তারা একসঙ্গে আরও বেশী প্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

*

এই সমস্ত জিনিসগুলি [নিম্নতন প্রাণের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মপরতা] হয় নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অথবা এ ভিন্ন যখন উচ্চতর চেতনা অবিরতভাবে নিম্নতন প্রাণের মাঝে নেমে আসে তারা খসে পড়ে, যেন উচ্চতর চেতনা সেগুলিকে গ্রাস করে নেয়। এক অকস্মাৎ বিলোপসাধনও হয়তো সম্ভবপর হতে পারে—অন্ততঃপক্ষে এ ব্যাপারে প্রচারিত ঘটনাবলী রয়েছে—কিন্তু সাধারণভাবে চলে যাওয়ার ব্যাপারে তারা বিলম্ব করে এবং ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়, ক্রমশ তাদের শক্তিকে হারিয়ে ফেলে যেন তারা অতীতের বিষয় হয়ে গেছে।

*

কখনও কখনও তোমার অহং জাগ্রত হয়ে ওঠে, আর সেটি যে অহং সে বিষয়ে তোমার কোন নিরীক্ষণ ব্যতিরেকেই তা ঘটে থাকে। তোমার উচ্চতর অংশগুলির মাঝে তা জেগে ওঠে না, কিন্তু জেগে ওঠে জড়গত মন ও চেতনার মাঝে, আর তুমি ভাব যে যেহেতু তোমার উচ্চতর অংশগুলি স্বচ্ছ, কাজেই এই অংশগুলিও বুঝি নির্মল।

*

অবশ্যই, ঐ ধরনের মন্ত্রণাগুলির অর্থ হল অহং-কে জাগ্রত করে তোলা। আমি মনে করি তারা যে অটলভাবে অবস্থান করছে তার কারণ হল এখনও পর্যন্ত অহং-কে

জাগ্রত করে তুলবার একটি আশা তারা পোষণ করছে। এমনকি যখন একজন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে উঠেছে, তখনও পর্যন্ত সব ধরনের মন্ত্রণার আগমন ঘটতে পারে। একজন হয় এদের কোন রকম গ্রাহ্য করে না অথবা অন্যথায় সত্তার কোন স্থানে অহং-এর কোন ক্ষুদ্রাংশ এখনও পর্যন্ত লুকিয়ে রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য একটি বার দৃষ্টিপাত করে।

*

এগুলি হল তামসিক অহং-এর অনুভূতি—অর্থাৎ রাজসিক অহং-এর মধ্যেকার কোন হতাশার প্রতিক্রিয়া। যথার্থ মনোভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কিংবা তাদের অনুষঙ্গী হয়ে পাশাপাশি চলা ছিল প্রাণের মধ্যস্থিত একটি দাবী, ''এখন আমি কিই-বা লাভ করছি, সর্বদা অবশ্যই আমার সেটি চাই, নতুবা আমি সাধনা করতে পারব না; যদি কোনদিন আমাকে তা হারাতে হয়, তাহলে আমি মারা যাব''—যেখানে সঠিক মনোভঙ্গীটি হল, ''এমনকি যদি একবারের জন্যও আমি তা হারাই, তাহলে তার কারণ হবে এই যে আমার মধ্যেকার কোন কিছুকে পরিবর্তিত হতে হবে যাতে শ্রীমায়ের চেতনা আমার মাঝে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, কেবলমাত্র অন্তরের মাঝে নয় বরং সত্তার প্রত্যেকটি অংশে।'' নিম্নতন শক্তিগুলি সত্তার দুর্বল অংশে আক্রমণ হেনেছে, তারা প্রাণের মাধ্যমে তাদের দাবীকে পেশ করেছে এবং একটি নিষ্ক্রিয়তার অবস্থাকে ঘটিয়ে তুলেছে, যে অবস্থার মাঝে পড়ে তুমি যার সাথে সংলগ্ন হয়ে ছিলে মনে হচ্ছে যে তা বুঝি-বা হারিয়ে গেছে, যেন পর্দার আড়ালে প্রস্থান করেছে। এইভাবে অহং-এর তামসিক প্রতিক্রিয়ার আগমন ঘটল, ''বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তাই-বা কি, তার থেকে বরং আমি মরে যেতেই বেশী পছন্দ করি।'' স্পষ্টতঃই তোমার সত্তার সমগ্র অংশই একথা বলছে না, এ হল হতাশাগ্রস্ত প্রাণ কিংবা তামসিক জড়ের মধ্যস্থিত একটি অংশের কথা। সক্রিয় দাবীগুলিকে চূর্ণ করে ফেলা এবং অপসারিত করাই যথেষ্ট নয়; কেননা এ আবার দাবীকে পূর্ণ করে তুলবার একটি নিষ্ক্রিয় পথও বটে, ''আমার দাবীগুলি পূর্ণ হচ্ছে না; আচ্ছা বেশ, আমি সেসব কিছুকে ছেড়ে দিচ্ছি, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।'' ওটিকে অবশ্যই অন্তর্হিত হতে হবে।

*

তামসিক অহং হল তাই যা নৈরাশ্য, দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা, আত্ম-অবমূল্যায়ন, কর্মে অনিচ্ছা, কোন কিছু জানবার অথবা উন্মুক্ত হয়ে উঠবার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা, অবসাদ, নিরুৎসাহ, কোনকিছুই না করাকে গ্রহণ ও সমর্থন করে। রাজসিক অহং-এর বিপরীতভাবে এ বলে, ''আমি এত দুর্বল, এত অন্ধকারাচ্ছন্ন, এত দুর্দশাগ্রস্ত, এতখানি পীড়িত এবং এতদূর অন্যায় ব্যবহার পেয়েছি যে—আমার কোন আশা নেই, কোন সফলতা নেই, আমি সবকিছুকে ত্যাগ করেছি, আমি অবলম্বনহীন, কিভাবেই-বা আমি এটি করতে





পারি, কিভাবেই-বা ওটি করে তুলব, এর জন্য আমার কোন শক্তি নেই, কোন সামর্থ্য নেই, আমি অসহায়; আমাকে মরে যেতে দাও; আমাকে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে এবং বিলাপ করতে দাও'', ইত্যাদি, ইত্যাদি। অবশ্য ঐ সমস্ত কিছুর তৎক্ষণাৎ বা প্রত্যেকটি ব্যাপারে নয়; কিন্তু আমি বিষয়টির সাধারণ প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করছি। (ক্রমশ)

**উৎস : *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, pp. 1379-81,**
**অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত**

# যোগপথের বাধাবিঘ্ন

**শ্রীঅরবিন্দ**

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১-এর পর)

যেখানে ভগবৎশক্তিকে স্বীকার করা এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রকৃতির অসঙ্গতিগুলির শনাক্তকরণ ব্যতিরেকে সেই শক্তির সাথে একজনের নিজের প্রকৃতির সমন্বয়সাধন করা সম্ভবপর হয় না, তবুও হয় অসঙ্গতিগুলির উপর নতুবা তাদের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকগুলির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হল একটি ভ্রান্ত মনোভঙ্গী কিংবা একজন যে বাধাগুলিকে ভোগ করছে তার দরুন ভগবানের ক্রিয়াকে অবিশ্বাস করা অথবা বিষয়গুলির অন্ধকার দিকটির প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে বড় বেশী জোর দেওয়া। এইভাবে চললে তা প্রতিবন্ধকগুলির শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে, আর অসঙ্গতিগুলিকে ধারাবাহিকতার এক বিশালতর অধিকার এনে দেয়। আমি কোন *কুয়ে* পন্থার অন্তর্গত আশাবাদের উপর জোর দিচ্ছি না— যদিও অতিশয় আশাবাদ অতিরিক্ত দুঃখবাদের তুলনায় বেশী সহায়ক; সেই কুয়েবাদ প্রতিবন্ধকগুলিকে লুকিয়ে রাখবার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং এ ভিন্ন, সকল কিছুর মাঝে সর্বদা একটি সামঞ্জস্যবিধান করবার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যাইহোক, তোমার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলিকে লুকিয়ে রাখা এবং নিজেকে বড় বেশী উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের আভাসের মাধ্যমে ভুলিয়ে রাখবার মধ্যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই; বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, তুমি সর্বদাই অন্ধকারের উপর খুব বেশী গুরুত্বকে আরোপ করেছ এবং এইভাবে চলবার দরুন তাকে আরও গভীরতর করে তুলেছ আর সেইসঙ্গে দিব্যআলোর মাঝে তোমার রক্ষা পাওয়ার জন্য যে দুয়ারগুলি রয়েছে তাদের রুদ্ধ করে তুলছ। বিশ্বাস, আরো বিশ্বাস! তোমার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস, আবরণের পশ্চাতে কর্মরত যে ভগবৎশক্তি তার উপর বিশ্বাস, যে কর্মকে উদ্‌যাপন করতে হবে এবং যে পথনির্দেশনাকে প্রদান করা হয়েছে তাদের প্রতি বিশ্বাস।

উচ্চস্তরের এমন কোন প্রয়াসেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না, আর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তো একেবারেই নয় যা খুবই অটল প্রকৃতির গুরুতর বাধাগুলিকে উত্থিত করে

তোলে না কিংবা তার সম্মুখীন হয় না। এই বাধাগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়ই হতে পারে এবং যদিও বৃহত্তর অর্থে সেগুলি মূলগতভাবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এক, তবুও তাদের প্রদত্ত প্রভাব অথবা তারা যে বাহ্যরূপ গ্রহণ করে থাকে তা ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে একটি বিশাল মাপের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সত্যকার একটি বাধা হল ভগবৎজ্যোতি ও শক্তির ক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতির সমন্বয়সাধন করা। সেটির সমাধান কর, তখন অন্য সবকিছু হয় অন্তর্ধান করবে নতুবা একটি গুরুত্বহীন স্থান গ্রহণ করবে; এমনকি সেই সমস্ত বাধাগুলি যারা আরও বেশী সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যারা আরও বেশী স্থায়ী কেননা রূপান্তরের কাজে তারা হল সহজাত, তাদের আর অতখানি গুরুতর বলে মনে হবে না, কারণ সহায়ক শক্তির অনুভূতি এবং সেইসঙ্গে বাধাগুলির গতিবৃত্তিকে অনুসরণ করবার জন্য এক বৃহত্তর শক্তির উপস্থিতি সেখানে রইবে।

*

বেশ, সেটি সঠিক। বাধাগুলির অন্তর্গত প্রতিবন্ধকগুলি হল স্বয়ং সৃষ্ট, তারা হল অজ্ঞানতার মধ্যেকার একটি গ্রন্থি; যখন কোন একটি আন্তর উপলব্ধি গ্রন্থিটিকে শিথিল করে দেয়, তখন বাধাটির সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থাটির অবসান ঘটে।

*

তোমার মধ্যেকার ভ্রান্ত গতিবৃত্তিগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তাদের জানা হল অপরিহার্য ব্যাপার; কেননা তারা হল তোমার সমস্যার উৎস এবং যদি তোমাকে এ সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হতে হয় তাহলে তাদের দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কিন্তু তাই বলে তোমার ত্রুটি এবং ভ্রান্ত গতিবৃত্তিসমূহের সম্বন্ধে অনুক্ষণ চিন্তা করে যেও না। তার পরিবর্তে তোমাকে যা হতে হবে, অর্থাৎ তোমার আদর্শের প্রতি আরও বেশী করে একাগ্র হও, এই বিশ্বাসের সঙ্গে যে, যেহেতু এই হল তোমার সম্মুখস্ত লক্ষ্য, তা অবশ্যই সম্ভব হয়ে উঠবে এবং তার আগমন ঘটবে।

সর্বদা দোষত্রুটি এবং ভ্রান্ত গতিবৃত্তিকে নিরীক্ষণ করে চললে তা বিষণ্ণতাকে নিয়ে আসে এবং বিশ্বাসকে নিরুৎসাহ করে তোলে। তোমার দৃষ্টিকে আরও বেশী করে আসন্ন আলোর অভিমুখে ফিরিয়ে ধর এবং যে কোন অব্যবহিত অন্ধকারের দিকে কম নজর দাও। অন্তিম বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস, প্রফুল্লতা, আত্মবিশ্বাস হল সেই বস্তু যারা সহায়তা করে,—তারা উন্নতিকে সহজতর ও দ্রুততর করে তোলে।

তোমার কাছে যে সমস্ত সহায়ক অভিজ্ঞতাগুলির আগমন ঘটে আরও বেশী করে তাদের অভিমুখী হও। সেই ধরনের একটি অভিজ্ঞতা ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যখন সেই অভিজ্ঞতার আগমনের নিবৃত্তি ঘটবে তখন ব্যথিত হয়ে পড় না অথবা নিজেকে নিরুৎসাহিত হতে দিও না, বরং নিজের অন্তরের গভীরে অচঞ্চল হয়ে অবস্থান কর এবং এক আরো শক্তিশালী রূপে তার পুনরাবৃত্তির জন্য





আস্পৃহা কর যা সতত এক গভীরতর ও পূর্ণতর অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভগবানের অভিমুখে নিজেকে সরল এবং সমগ্রভাবে উন্মুক্ত করে, আরও বেশী অচঞ্চলতার সঙ্গে নিরন্তর আস্পৃহা করে চল।

*

ত্রুটিগুলিকে নিরীক্ষণ ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কিন্তু একাগ্রতাসাধন নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন—আর সেই অভিনিবেশ হবে তোমাকে যা হতে হবে তারই উপরে অর্থাৎ এই বিরুদ্ধ দিকটির পরিবর্তে বরং নবচেতনার বিকাশের উপরে একাগ্রতা আনা।

*

তোমাকে ভ্রান্ত গতিবৃত্তিসমূহ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে হবে, কিন্তু তার অর্থ কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে তোলা নয়।

*

এটি [মন থেকে প্রাণের মাঝে প্রসারিত হওয়া] এসেছে প্রকৃতির অসম্পূর্ণতাগুলি সম্বন্ধে খুব বেশী মাত্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বার দরুন। তোমার অন্তরের গভীরে কোনো কিছুর ভাল দিকটির মধ্যে বসবাস করাই সর্বদা অনেকবেশী শ্রেয়। আমি এই অর্থ করছি না যে তা হবে অহংসর্বস্বরূপে, বরং তা সম্পন্ন হবে বিশ্বাস ও প্রফুল্লময় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আহ্বান জানিয়ে যার জন্যে প্রকৃতি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে উঠেছে যাতে যে সমস্ত কিছুকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সেই পরিবর্জনের কাজে একটি নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিত বিকাশ সাহায্য করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রায়শই একজন প্রাণিক প্রতিবন্ধকতার মাঝে অভিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং তারপর মন থেকে চৈত্যে (হৃদ্‌কেন্দ্রের মাধ্যমে) যাওয়ার পরিবর্তে তাকে বিক্ষুব্ধ প্রাণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

*

এটি [একজনের পদক্ষেপকে প্রাণ থেকে চৈত্যে ফিরিয়ে আনা] করা যেতে পারে, যদি তুমি তোমার বাধাবিঘ্নগুলি সম্পর্কে ভাবনার দ্বারা আগে থেকেই পরিপূর্ণ হয়ে থাকাকে প্রত্যাখ্যান কর এবং সত্যকার সহায়ক ও যথার্থ বিষয়গুলির উপরেই অভিনিবিষ্ট হও। প্রফুল্লময় ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠ। সেখানে সন্দেহ ও বাসনা অ্যাণ্ড কোং উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু সন্দেহ নয়, বরং তোমার অন্তরের গভীরে ভগবানও উপস্থিত রয়েছেন। তোমার দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে ধর আর দৃষ্টিপাত করে চল যে পর্যন্ত না আবরণটি ছিন্ন হয়ে উঠছে এবং তুমি স্বয়ং ভগবান অথবা ভগবতী জননীর দর্শন লাভ করছ!

(ক্রমশ)

**উৎস: *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, pp. 1686-88,**
**অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত**

# আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর

**শ্রীঅরবিন্দ**

(পূর্বসংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১-এরপর)

প্রশ্নটি উঠেছিল এবং সর্বদাই উঠে থাকে এইজন্য যে প্রাণময় সত্তার যে কোন জোরাল অভিজ্ঞতার পর্যায়কে প্রাণময় শেষ স্তর ব'লে মনে করার ব্যাকুলতার জন্য, এমনকি তাকে অধিমানস, অতিমানস, পূর্ণ সিদ্ধি ব'লে মনে করায়। অতিমানস বা অধিমানস এর কোনটিতে সেরকম সহজে পৌঁছান যায় না, এমনকি কেবল কোন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বা আন্তর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও নয়। তুমি যে অভিজ্ঞতা অনুভব করছ তা হ'ল আধ্যাত্মিক এবং মুক্ত মনের বিষয়। এই পর্যায়ে উচ্চতর মনের স্তরগুলির থেকে কিছু বার্তা আসতে পারে। কিন্তু এই বার্তাগুলি কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা, চেতনার পূর্ণ পরিবর্তন নয়, অতিমানস মনের অংশ নয় বা মনের এক উচ্চস্তরও নয়—এটি সম্পূর্ণ অন্য কিছু। কোন সাধক তার নিজের চেষ্টার দ্বারা অতিমানসে পৌঁছাতে পারে না এবং ব্যক্তিগত তপস্যার দ্বারা তা করা অনেক মুস্কিলের, কারণ যতদিন না সত্তা প্রস্তুত হয়ে উঠছে ততদিন শান্তভাবে স্তরের পরে স্তরে যেতে হবে এবং সে ক্ষেত্রেও একমাত্র দিব্যকৃপা সত্যকার অতিমানসিক পরিবর্তন আনতে পারে।

*

অতিমানসের দুয়ার এইভাবে চূর্ণ করে খুলে দেওয়া যায় না। আধারকে স্থিরভাবে প্রস্তুত করতে হবে, পরিবর্তিত করতে এবং অতিমানসের অবতরণের জন্য যোগ্য করতে হবে। সাধারণ মন ও অতিমানসের মধ্যে যেন কয়েকটি শক্তি রয়েছে এবং এইগুলিকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং চেতনায় আত্মসাৎ করতে হবে—কেবল তার পরেই অতিমানস পরিবর্তন সম্ভব।

*

"যখন সচেতন নয় তখন অতিমানস থেকে শক্তি লাভ করা" একথা বলা খুব খুবই আশ্চর্যজনক। যখন কেউ সচেতন নয়, তখনও কোন উচ্চতর শক্তি লাভ করতে পারে, দিব্যশক্তি প্রায়ই আড়ালের পিছন থেকে কাজ করে, তা নয়ত মানুষী সত্তার অজ্ঞ ও অচেতন অবস্থায় তা আদৌ কাজ করতে পারবে না। কিন্তু শক্তির প্রকৃতি বা ক্রিয়া সাধকের অবস্থার উপযুক্ত করে পরিবর্তিত করা হয়,সরাসরি অতিমানস শক্তি থেকে কিছু গ্রহণ করার পূর্বে একটি মসৃণের চেতনা বিকশিত করতে হবে এবং এমনকি তার কোন কিছু অধিমানস বা অন্য অন্তর্বর্তী ক্ষেত্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে গ্রহণ করতে হ'লে চেতনায় অতি অগ্রগণ্য হতে হবে।

*





কারুর পক্ষে সময়ের পূর্বে অতিমানসকে লাভ করার বা এমনকি তার ছোঁয়াচ আস্বাদনের কাজ অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। এইরূপ দাবির সাথে সাথে সাধারণত অতিমাত্রায় অহংভাবের অভিপ্রকাশ বা এক স্থূল পতন, ভুল পরিস্থিতি এবং ভুল গতিবিধি আসে। খানিকটা আধ্যাত্মিক বিনয়, নিজের দিকে গভীর নিরহঙ্কার দৃক্‌পাত এবং নিজের বর্তমান প্রকৃতির অমসৃণতার বিষয়ে শান্তভাবে অবগতি এবং আত্ম-প্রশংসা ও আত্ম-আরোপের পরিবর্তে নিজের বর্তমান সত্তাকে অতিক্রম করার প্রয়োজন, অহংভাবাত্মক উচ্চাকাঙ্ক্ষার থেকে নয়, বরং যা হবে ভগবানের অভিমুখে এক এষণা, এইগুলি এই ভঙ্গুর পার্থিব ও মানুষী গঠনের পক্ষে অতিমানস পরিবর্তনের প্রতি অগ্রসরের অধিকতর উত্তম পরিস্থিতি।

*

অধিমানস ও অতিমানসের বিষয় জানতে হ'লে তার পূর্বে বোধিগতরূপে সচেতন হ'তে হবে, 'লক্ষণ' দেওয়া নিরর্থক, কারণ 'লক্ষণ' দেখে বিচার করতে গিয়ে মন কেবল ভুল করবে—নিজেকে অন্তরে সচেতন হ'তে হবে এবং সরাসরি জানতে হবে।

*

কে বলেছে যে তা (অতিমানস) মন ও প্রাণকে স্পর্শ না ক'রে শারীর চেতনায় নেমে আসছে? অবশ্যই সত্তার কোন অংশই অতিমানসের অধীনে আসে নি—সমগ্র সত্তা অতিমানসের প্রভাবে না আসা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। অতিমানসের প্রভাব প্রথমে আসতে হবে, অতিমানস রূপান্তর কেবল তার পরে আসতে পারে।

*

অতিমানসের স্পর্শ বা প্রভাব আর অতিমানসের আয়ত্তাধীন হওয়া এক জিনিষ নয়। মন ও প্রাণ অতিমানসের আয়ত্তাধীন হওয়ার পূর্বে শারীর সত্তা অতিমানসের আয়ত্তাধীন হচ্ছে এরূপ মনে করা হাস্যকর। আমি যা বলেছিলাম তা হ'ল মন ও প্রাণ অতিমানসের অধীনে আসতে পারে না, যতদিন শারীর সত্তা অতিমানসের অবতরণের স্পর্শ লাভ না ক'রে পূর্বের মতন রয়েছে।

*

না, আমি তা আদৌ বলিনি। মন ও প্রাণে পূর্ণ অতিমানস পরিবর্তনের পূর্বে দেহকে গ্রহণ করা অতিমানসের পক্ষে অসম্ভব।

'ক' এবং অন্যেরা যেন সবসময়েই কোনও অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশা করছে যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—তারা বুঝতে পারে না যে এটি ঘন-নিবদ্ধ বিবর্তন, দ্রুত কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে। কোন অলৌকিক ঘটনা এক মুহূর্তের জন্য আশ্চর্যজনক হতে পারে। কেবল দিব্য নীতি অনুসারে সংঘটিত পরিবর্তন স্থায়ী হতে পারে।

*

এটি (অতিমানস) জড় চেতনায় অবতরণের পূর্বে মন ও প্রাণে অবতরণ করান যায় না। তবে কেউ এর প্রভাব অনুভব করতে পারে বা এর কিছু একটা লাভ করতে পারে, কিন্তু অবতরণ করান বলতে আরও অনেক বেশী কিছু বুঝায়।

অতিমানস একটি আলোকজ্জ্বল পূর্ণ—এটি আলোক ও অজ্ঞতার সংমিশ্রণ নয়। যদি বহির্মন অতিমানসে পরিবর্তিত না হয়, তাহলে মনে অজ্ঞতার সংমিশ্রণ থাকবে, তাহলে সেখানে অতিমানস থাকবে না, থাকবে অন্য কিছু—প্রাণের বেলায়ও সেইরূপ। মনে পৃথকভাবে যা কিছু প্রকাশিত হতে পারে তা হ'ল আংশিক অতিমানসে পরিবর্তিত অধিমানস।

যদি অতিমানস মন ও প্রাণে থাকতে পারে, তাহলে এটি অবশ্যই শারীরচেতনাতেও থাকতে পারে। যদি তা শারীর চেতনায় থাকতে না পারে, তাহ'লে তা মনে ও প্রাণেও থাকতে পারবে না; এটি হবে অন্য কিছু, অতিমানস নয়।

*

সেটি আদৌ সম্ভব নয়। শারীর চেতনা তো রয়েছে এবং তাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না, অতএব শারীর চেতনাকে পরে করার জন্য রেখে দিয়ে উচ্চতর অংশগুলিকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করা যেতে পারে না, আবার প্রত্যেক পর্যায়কে এক এক করে তার সকল অংশে পরিবর্তিত করে তারপর পরের পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমি এইভাবে করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তা আদৌ কার্যকর হয় নি। মন ও প্রাণকে বহুলাংশে অধিমানসে রূপান্তরিত করা প্রথম পদক্ষেপ, যথা, অধিমানসকীকরণে যদি শারীর চেতনার সমস্ত নিম্ন গতিবিধি অধিমানসের আয়ত্তাধীন না হয়, তবে যতদিন তাদের অধিমানস পর্যায়ে না নিয়ে যাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত শারীর চেতনা সর্বদাই দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে। অধিমানসকে সুসম্পূর্ণ করতে হ'লে অতিমানস শক্তিকে আবাহন করতে হবে এবং কেবল যখন অধিমানস খানিকটা অতিমানসিক হয়েছে, তখনই শরীর ক্রমশ অধিক অধিমানসে পরিবর্তিত হওয়া শুরু করে। আমি এই প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়ার উপায় দেখি না, যদিও এটিই এই প্রক্রিয়াকে এত সময় সাপেক্ষ করে।

*

যখন কোন উচ্চতর শক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নের স্তরে আসে, তখন এটি সেই নিম্নস্তরের নিকৃষ্ট বস্তু, অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি এবং সেই স্তরের মিশ্রিত গতিবিধির দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত ও পরিবর্তিত হয়। যেরকম, যদি অধিমানস শক্তি আলোকিত মনের মাধ্যমে কাজ করে, তখন তার সত্য ও স্বাধীনতার একটি অংশমাত্র প্রকাশিত হয় ও কার্যকর হয়—যতটা পরিমাণে তা এই অপেক্ষাকৃত অল্প চেতনার মধ্যে দিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এবং যা আসতে সক্ষম হয় তা অপেক্ষাকৃত কম সত্য, অন্যবস্তুর সঙ্গে সংমিশ্রিত, অপেক্ষাকৃত কম অধিমানসিক, সহজে অংশতঃ সত্য ও অংশতঃ ভুলে পরিবর্তিত হয়। যখন এই





হ্রস্বীকৃত পরোক্ষ শক্তি আরও নিম্নে মনে ও প্রাণে অবতরণ করে, তখনও তার ভিতর সৃষ্টিশীল, অধিমানসিক সত্যের কিছুটা থাকে, কিন্তু তা অতি খারাপভাবে মানসিক ও প্রাণময় গতিবিধির সাথে মিশ্রিত হয়, যেগুলি তাকে বিকৃত করে এবং কেবল অর্ধ-কার্যকর হয়, কখনও-বা আদৌ কার্যকর হয় না।

*

যতক্ষণ বর্হিচেতনা প্রস্তুত হয় নি, ততক্ষণ অতিমানসের দ্বারা অন্য স্তরগুলির উপর বিজয় লাভ সম্ভব নয়, কেবল একটি প্রভাব আসতে পাবে।

*

আর যতক্ষণ শারীর চেতনা প্রস্তুত করা হয় নি ততদিন মন ও প্রাণকে ত্রুটিহীন করা কি করে সম্ভব— কারণ মানসিক এবং প্রাণময় শারীর চেতনা বলে যেটি রয়েছে, সেটি প্রস্তুত না হ'লে মন ও প্রাণ সুসম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারে না। (ক্রমশ)

**উৎস : *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, pp. 1225-29,**
**অনুবাদ : মনোজ ভট্টাচার্য**

...যখনই আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম, তাঁর মাঝে আমার সেই সুপরিচিত সত্তাকে যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করতাম তাঁকে চিনতে পারলাম...।

আর আমার স্থান ও আমার কর্ম যে তাঁরই কাছে, ভারতবর্ষে, এ ব্যাপারে আমি যেন পূর্ণ প্রত্যয়ী ছিলাম,...

উৎস: *Words of the Mother,* Cent Edi.Vol.No.13,P.39
অনুবাদ: দেবযানী সেনগুপ্ত